দু ঘণ্টার ভালোবাসা

রমানাথ রায়

মডার্ন কলাম
১০/২এ, টেমার লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯

DU GHANTAR BHALOBASHA

A collection of ten short stories

by Ramanath Ray

প্রথম প্রকাশ : মাঘ ১৩৬৮

প্রকাশিকা : লতিকা সাহা, মডার্ন কলাম, ১০/২এ, টেমার লেন, কল-৯

মুদ্রাকর : সনাতন পাল। প্রিন্টিং উদ্যোগ
১৯-ডি/এইচ/১৪, গোয়াবাগান স্ট্রিট, কল-৬

প্রচ্ছদ : অনুপ রায়

এই লেখকের

শ্রেষ্ঠ গল্প

প্রিয় গল্প

ছবির সঙ্গে দেখা

সূচীপত্র

দু ঘণ্টার ভালোবাসা

ভিতরে আসতে পারি ?

আজ অফিস নেই। মনোযোগ দিয়ে খবরের কাগজ পড়ছিলাম। পড়া আর হল না। কাগজ থেকে মুখ তুললাম। দেখি, দরজার বাইরে শার্ট-প্যান্ট পরা একটি লোক মুখে হাসি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তার হাতে একটা চামড়ার বড় ব্যাগ। লোকটির পাশে একটি কুমারী মেয়ে। বয়স বাইশ তেইশ হবে। দেখতে মন্দ নয়। এর পিঠে মনে হয় একজোড়া ডানা আছে।

লোকটি আবার জিজ্ঞেস করল, ভিতরে আসতে পারি ?

কি উদ্দেশ্য তা না জেনে অপরিচিত কাউকে ভিতরে আসতে দেওয়া যায় না। আমি জানতে চাইলাম, আপনারা কোত্থেকে আসছেন ?

লোকটি খুব বিনয়ের সঙ্গে বলল, আমরা নবীন বিস্কুট কোম্পানি থেকে আসছি।

এবার বুঝতে পারলাম লোকটি সেলসম্যান। বাড়ি বাড়ি বিস্কুট বিক্রি করতে বেরিয়েছে। ভদ্রতা করে বললাম, আসুন।

অনুমতি পেয়ে লোকটি ঘরে ঢুকল। সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটিও ঢুকল। আমি সামনে দুটো খালি চেয়ার দেখিয়ে দুজনকেই বললাম, বসুন।

দুজনে পাশাপাশি বসল।

লোকটি এবার হাত থেকে চামড়ার ব্যাগ মাটিতে নামিয়ে রেখে জিজ্ঞেস করল, আপনি নিশ্চয় বিস্কুট খান ?

বললাম, খাই।

—থিন অ্যারারুট ? ক্রিম ক্র্যাকার ? স্ন্যাক্স ?

—থিন অ্যারারুট।

—কোন কোম্পানির ?

নাম বললাম।

—কেমন লাগে ?

ভালো।

আমাদেরটা একবার খেয়ে দেখুন। আমার ধারণা খুব ভালো লাগবে। —বলে লোকটি ব্যাগের ভিতর থেকে একটা থিন অ্যারারুট বিস্কুট বের করে আমার হাতে তুলে দিল।

আমি বিস্কুটটা খেলাম। খেয়ে ভালো লাগল। বললাম, বাহ্। বেশ ভালো খেতে। প্যাকেট কত করে?

লোকটি হেসে বলল, আমাদের দুশো গ্রামের প্যাকেট। প্রতি প্যাকেটের দাম সাড়ে পাঁচ টাকা। আমরা প্রতি প্যাকেটের সঙ্গে একটা গিফট দিচ্ছি।

গিফটের কথা শুনে উৎসুক হয়ে উঠলাম। জিজ্ঞেস করলাম, কি গিফট?

লোকটি মেয়েটির মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, আপনি এর গালে একটা চুমু খেতে পাবেন।

কথাটা শুনে চমকে উঠলাম, সত্যি?

—সত্যি।

—যদি দুটো নিই?

—তাহলে দুটো চুমু। আর যদি দশ প্যাকেট নেন তাহলে এর সঙ্গে দু ঘণ্টা সময় কাটাতে পারবেন। আপনার একটা অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হবে।

—কিরকম?

—আমাদের কোম্পানির বিস্কুট খেলে যেমন একটা আশ্চর্য রকমের অনুভূতি হয়, ঠিক সেইরকম অনুভূতি হবে।

আমি রীতিমত অস্থির হয়ে পড়লাম। বললাম, আপনি আমায় দশ প্যাকেট বিস্কুট দিন।

লোকটি ব্যাগ থেকে আমায় গুনে গুনে দশ প্যাকেট বিস্কুট দিল। আমিও সঙ্গে সঙ্গে দাম মিটিয়ে দিলাম।

লোকটি টাকা পকেটে পুরে ব্যাগ হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়াল। দাঁড়িয়ে বলল, এখন বেলা দশটা। আপনি বারটার সময় ওকে ছেড়ে দেবেন।

—আচ্ছা।

লোকটি চলে গেল।

আমি মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার নাম?

—টিনা।

—তোমাকে রোজ এ কাজে বেরতে হয়?

—হ্যাঁ।

—ভালো লাগে?

—খুব।

—কেন?

—রোজ কত লোকের সঙ্গ পাই। আমার ভীষণ ভালো লাগে।

এই সময় টিনার হাত দুটোর দিকে আমার চোখ পড়ল। ফর্সা সুন্দর গোল হাত। ইচ্ছে হল ঐ হাত দুটো নিজের হাতের মুঠোয় নিয়ে আসি। কিন্তু বাড়িতে এসব সম্ভব নয়। পাশের ঘরে মা ক্যান্সারে কষ্ট পাচ্ছে। দিদি রান্নাঘরে ম্লান মুখে তরকারি কুটছে। ছোট বোন স্নানঘরে ঢুকে স্নান করছে। একটু পরেই দিদি কিংবা বোন আমার ঘরে ঢুকবে। ঢুকে আমাকে টিনার হাত ধরে বসে থাকতে দেখলে বিব্রত হবে, আমিও লজ্জায় পড়ে যাব। নাহ্। বাড়িতে টিনাকে নিয়ে বসে থাকা যাবে না। টিনাকে যদি ভালোবাসতে হয় তাহলে বাইরে বেরিয়ে পড়া দরকার। তবে তার আগে টিনার মতটা জানা চাই।

আমি জিজ্ঞেস করলাম তুমি কি বাড়িতে থাকতে চাও? নাকি…

টিনা হেসে বলল, আপনি যা বলবেন।

—তাহলে চলো, বাইরে যাই।

—চলুন।

আমি সঙ্গে সঙ্গে জামা-প্যান্ট পরে তৈরি হয়ে নিলাম। মা কোনরকমে কষ্ট করে জিজ্ঞেস করল, কোথায় যাচ্ছিস? উত্তরে মিথ্যে কথা বললাম, একটা কাজে। দিদি রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, কখন ফিরবি? বললাম, একটু পরে। ছোট বোন স্নানঘরে ছিল। সে কোন প্রশ্ন করল না।

আমি টিনাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। রাস্তায় পা দিয়ে বাড়ির কথা ভুলে গেলাম। টিনার কাঁধ থেকে টিনার ফর্সা হাত ঝুলছিল। আমি নিজেকে সামলাতে পারলাম না। টিনার বাঁ হাত আমার ডান হাতের মুঠোয় ধরলাম। কি নরম তুলতুলে হাত। আমার ভীষণ ভালো লাগল। আমার শরীর যেন হাল্কা হয়ে গেল। মনে হল মাটিতে আমার পা নেই। মনে হল আমার পিঠে দুটো ডানা গজিয়েছে। ইচ্ছে করলেই আমি এখন যেখানে খুশি উড়ে যেতে পারি।

টিনা জিজ্ঞেস করল, কোথায় যাবেন?

উত্তরে আমিও জিজ্ঞেস করলাম, কোথায় যাওয়া যায় ?

—কাছে একটা পার্ক আছে। সেখানেই চলুন, গিয়ে বসি।

—ঐ পার্কে তো প্রায়ই যাই। একা একা বসে থাকি। তার চেয়ে বরং...কথাটা শেষ না করে একটা ভালো জায়গার কথা ভাবতে লাগলাম। ভাবতে ভাবতে হঠাৎ বলে উঠলাম, পেয়েছি।

টিনা অবাক হয়ে জানতে চাইল, কি পেয়েছেন ?

একটু থেমে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার ডানা আছে ?

টিনা আমার প্রশ্ন যেন বুঝতে পারল না। বিস্মিত হয়ে বলল, ডানা !

—হ্যাঁ ডানা।

—মানুষের আবার ডানা থাকে নাকি !

—থাকে, অনেক মেয়ের থাকে। তোমাকে দেখে মনে হয়েছিল তোমার ডানা আছে। এখন আমার সব গোলমাল হয়ে গেল।

—কেন ?

—তোমার যদি ডানা থাকত তাহলে তোমার পিঠে চেপে উড়তে উড়তে কোনো পাহাড়ে চলে যেতাম, কিংবা কোনো সমুদ্রের ধারে, কিংবা...

—আপনার কলকাতা ভাল্লাগে না ?

—না। আমি যদি কোনদিন বিয়ে করি তাহলে বিয়ের পর কলকাতা ছেড়ে চলে যাব।

—কোথায় ?

—যেখানে খুশি।

এ কথার পর টিনা আর কিছু বলল না। আমিও আর কিছু বললাম না। টিনার হাত ধরে হাঁটতে লাগলাম। হাঁটতে হাঁটতে সারি সারি ঝুপড়ি, খেতে না পাওয়া মানুষ, ভাঙাচোরা রাস্তা, আবর্জনার স্তূপ, লোম ওঠা কুকুর, বিকল ট্যাক্সি, কেরোসিনের জন্যে লাইন, উদাসীন কনস্টেবল পেরিয়ে গেলাম। রাস্তার দুধারে প্লাস্টার খসা ম্লান বাড়ি, বাড়ির দেওয়ালে ভুল বানানে লেখা নানা স্লোগান, নানা নাম, নানা অভিযোগ, নানা মিথ্যে প্রতিশ্রুতি।

হাঁটতে হাঁটতে চিরচেনা পার্ক পড়ল।

টিনা বলল, আর পারছি না। একটু বসা যাক।

আমি কি করব ? টিনার ডানা নেই। অতএব টিনাকে নিয়ে পার্কের ভিতরে ঢুকলাম। একটা বড় বকুল গাছের নিচে একটা বেঞ্চ। বেঞ্চ খালি।

আমরা বেঞ্চিতে গিয়ে পাশাপাশি বসলাম। বসে তেমন ভালো কথা খুঁজে না পেয়ে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার বাড়িতে কে কে আছে?

—বাবা, মা আর ছোট ভাই।

—বাবা কি করেন?

—বছরখানেক হল বাবা চাকরি থেকে অবসর নিয়েছেন।

—ভাই?

—ভাই কলেজে পড়ে।

—তোমার আয়েই তাহলে সংসার চলে?

—অনেকটা।

—অনেকটা কেন?

—আমার আয় ছাড়াও বাবার আয় আছে।

—কিসের আয়?

—বাবা মাসে মাসে পেনশন পান।

ওহ্!—বলে একটু থেমে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কাউকে ভালোবাস?

—না।

—কেন?

—আমার অত সময় নেই। আমার ভালোবাসা সবসময় দু ঘণ্টার।

আমি এ কথার পর আর কথা খুঁজে পেলাম না। টিনার মত আমারও কাউকে ভালোবাসার সময় নেই। সংসারে আমার নানা সমস্যা। মা ক্যান্সারের রুগী। বেশিদিন হয়ত আর বাঁচবে না। তাই বলে ডাক্তারের খরচা, ওষুধের খরচা বন্ধ হয়নি। দিদির যথাসময়ে বিয়ে হয়েছিল। কিন্তু স্বামীর সঙ্গে বনিবনা না হওয়ায় ঘর ছেড়ে চলে এসেছে। কার দোষ তা জানি না। তবে জামাইবাবু লোকটি মনে হয় বিশেষ সুবিধের নয়। তিন বছর হয়ে গেল। দিদিও যাবার নাম করে না, জামাইবাবুও নিতে আসে না। তাই দিদির খরচাও আমাকেই টানতে হয়। আর ছোট বোনের বিয়ে এখনও হয়নি। একটা ভাল পাত্রের জন্যে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি। অনেকে দেখেও গেছে। বোনের গায়ের রং কালো বলে কারও পছন্দ হচ্ছে না। এখন বোন যদি কাউকে ভালোবেসে বিয়ে করে আমি নিশ্চিন্ত হই। যতদিন বোনের বিয়ে না হচ্ছে ততদিন বোনের যাবতীয় দায়দায়িত্ব একা আমার। সাত বছর আগে বাবা মারা গেছে। তারপর থেকে সংসারের

বোঝা আমাকেই বহন করতে হচ্ছে। আর পারছি না। মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে সব ছেড়েছুড়ে কোথাও চলে যাই।

টিনা আমার চিন্তিত মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, কি ভাবছেন?

মনটাকে হাল্কা করার জন্যে টিনাকে বাড়ির সব কথা বললাম।

সব শুনে টিনা চুপ করে রইল।

আমি বললাম, তোমায় একটা অনুরোধ কবর?

—কি?

—আমায় একটু ভালোবাসবে?

—আগেই তো বললাম, কাউকে ভালোবাসার সময় আমার নেই।

—তা জানি। তবু যদি চেষ্টা করে মাঝে মাঝে কাজের ফাঁকে একটু সময় করতে পার তাহলে খুব ভালো হত। তোমার সঙ্গে কোথাও গিয়ে বসতে পারতাম, দুটো গল্প করতে পারতাম।

—সম্ভব নয়।

—আমি তোমায় বিয়ে করব।

বিয়ে!—টিনা চমকে উঠল।

হ্যাঁ!—বলে খুব আগ্রহের সঙ্গে টিনার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

টিনা নিমরাজি হয়ে বলল, কিন্তু ভাই যতদিন না চাকরি পাচ্ছে ততদিন···

—আমি ততদিন অপেক্ষা করব।

টিনা এবার হেসে উঠল। বলল, অপেক্ষা? আপনার আগে আরও দুজন ঠিক এই কথাই বলেছিল। কিন্তু কেউই ছ মাসও অপেক্ষা করেনি।

—আমাকে বিশ্বাস কর। আমি ঠিক অপেক্ষা করব।

উত্তরে টিনা কিছু বলল না। নিজের হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে শুধু জানাল, এক ঘন্টা হয়ে গেছে। আপনি কিন্তু আর এক ঘন্টা আমার সঙ্গ পাবেন।

কথাটা শুনেই একটা ধাক্কা খেলাম। মনে পড়ল দশ প্যাকেট নবীন থিন অ্যারারুট কিনেছি বলে দু ঘন্টার জন্যে টিনাকে উপহার হিসেবে পেয়েছি। এক ঘন্টা কেটে গেছে। আর এক ঘন্টা আছে। তারপর টিনার সঙ্গে আর আমার কোন সম্বন্ধ থাকবে না। টিনা তার অফিসে চলে যাবে, আমি ফিরে যাব বাড়িতে। আবার চোখের সামনে দেখব মা ক্যান্সারে একটু একটু করে মারা যাচ্ছে, দেখব দিদির দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মুখ, ছোট বোনের বিষন্ন চোখ! কারও

মুখে একটু হাসি নেই। চারদিকে এক দমবন্ধ করা পরিবেশ। আমার কিছু করার নেই। এই অসহ্য পরিবেশের মধ্যেই কোনরকমে মুখ বুজে আমায় পড়ে থাকতে হবে। আমি কোথাও কোনদিন এদের ছেড়ে চলে যেতে পারব না। অথচ প্রতি মুহূর্তে এই বাড়ি ছেড়ে অনেক দূরে চলে যেতে ইচ্ছে করবে।

নিজেকে এই মুহূর্তে ভীষণ অসহায় মনে হল। মনে হল আমার পাশে কেউ নেই। আমার আর বসে থাকতে ইচ্ছে হল না। মনে হল, এখনি কোথাও চলে যাই। আমি উঠে দাঁড়ালাম।

টিনা জিজ্ঞেস করল, উঠলেন কেন?

—ভালো লাগছে না।

—চলুন তাহলে আবার একটু হাঁটা যাক। হাঁটলে মন ভালো হয়ে যাবে।

আমি কিছু বললাম না। টিনা উঠে দাঁড়াল। আমি আবার টিনার হাত ধরলাম। ধরতেই আবার সেই অদ্ভুত অনুভূতি ফিরে এল। মনে হল আমার শরীর হাল্কা হয়ে গেছে। মনে হল মাটিতে আমার পা নেই। মনে হল আমার পিঠে দুটো ডানা গজিয়েছে। ইচ্ছে করলেই আমি এখন যেখানে খুশি উড়ে যেতে পারি।

পার্ক থেকে বেরিয়ে আমরা আবার হাঁটতে লাগলাম। হাঁটতে হাঁটতে একসময় জিজ্ঞেস করলাম, তোমার জানাশুনো ভালো মেয়ে আছে?

টিনা কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করল, কেন? কি হবে?

—আমায় একটু ভালোবাসবে।

—কিরকম দেখতে হবে?

—ফর্সা রং, লাল ঠোঁট, টানা টানা চোখ, সরু কোমর, লম্বা পা, আর···

—আর কি?

—আর পিঠে যেন দুটো ডানা থাকে। আমি যেন তার পিঠে চড়ে যেখানে খুশি যেতে পারি।

টিনা আমার কথা শুনে হিহি করে হাসতে লাগল।

আমি রাগের ভান করে বললাম, হাসছ কেন?

টিনা বলল, হাসব না! একটু আগেই আপনি আমার জন্যে প্রায় সারা জীবন অপেক্ষা করতে রাজি ছিলেন। অথচ কয়েক মুহূর্ত যেতে না যেতে আপনি আর আমাকে চাইছেন না। আপনি এখন অন্য মেয়ের কথা ভাবতে শুরু করেছেন।

—কি করব। তোমার যে ডানা নেই।

—ডানা কারও থাকে না।

একথা শুনে প্রতিবাদ করে বললাম, নিশ্চয় থাকে।

টিনা কোন তর্কে গেল না। আমিও আর কিছু বললাম না। আমরা নিঃশব্দে হাঁটতে লাগলাম। আমার হাতের মধ্যে টিনার হাত। কি নরম! কি তুলতুলে! আহ্! টিনার পিঠে যদি দুটো ডানা থাকত! হাঁটতে হাঁটতে আমরা একটা রেস্তরাঁর সামনে এসে দাঁড়ালাম। আমি টিনাকে জিজ্ঞেস করলাম, চা খাবে?

—খেতে পারি।

আমরা রেস্তরাঁর ভিতরে ঢুকলাম। একটা খালি টেবিলে মুখোমুখি বসলাম।

বেয়ারা এসে জিজ্ঞেস করল, কি খাবেন?

বললাম, দুটো চা, আর···

টিনা বলল, আর কিছু না।

—কেন? একটা ওমলেট খাও।

—না।

—একটা কেক?

—না।

আমি আর অনুরোধ করলাম না। বেয়ারার মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম, তাহলে শুধু দু কাপ চা দাও।

পাঁচ মিনিটের মধ্যে বেয়ারা দু কাপ চা দিয়ে চলে গেল। আমি চা খেতে খেতে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার সঙ্গে আর কি দেখা হবে?

—আপাতত নয়।

—কেন?

—কাল দুর্গাপুর যাব। তারপর আসানসোল, তারপর বর্ধমান, তারপর বহরমপুর, তারপর···

—ওসব জায়গায় গিয়ে কি করবে?

—আপনার সঙ্গে এতক্ষণ যা করলাম, তাই করব।

—আবার কবে কলকাতায় ফিরবে?

—ঠিক নেই।

—তোমার সঙ্গে তাহলে আর দেখা হবে না ?

—সম্ভাবনা খুব কম। আর দেখা হয়েই বা কি হবে ?

—কেন ?

—আমার তো ডানা নেই।

—তাহলে এই শেষ ?

হয়ত। —বলেই টিনা হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে উঠে দাঁড়াল। বলল, চললাম, বারটা বাজে।

আমি উত্তরে কিছু একটা বলতে চাইলাম। কিন্তু কথাটা বলার আগেই টিনা দ্রুত পায় রেস্তরাঁ থেকে বেরিয়ে গেল। আমার দিকে একবার ফিরেও তাকাল না।

আমি বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ বসে রইলাম। টিনা এত সহজে আমাকে ছেড়ে চলে যেতে পারল। আমার জন্যে ওর একটু কষ্ট হল না। হতে পারে এটা দু ঘণ্টার ভালোবাসা, কিন্তু তাই বলে এর কোন দাম নেই। যাবার আগে আমার দিকে একবার ফিরে তাকানোর প্রয়োজন বোধ করল না। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়ালাম। চায়ের দাম মিটিয়ে দিয়ে বাড়ি ফিরে এলাম। বাড়িতে ঢুকতেই দিদি বলল, মা-র শরীরটা আজ একদম ভালো নেই।

ছোট বোন বলল, মা খুব কষ্ট পাচ্ছে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, তোদের খাওয়া হয়ে গেছে ?

দিদি বলল, না।

ছোট বোন বলল, তোর জন্যেই বসে আছি।

আমি তাড়াতাড়ি জামা-প্যান্ট ছেড়ে স্নান করে খেতে বসলাম। সঙ্গে দিদি ও ছোট বোন বসল। খেতে খেতে আমরা কেউ একটা কথা বললাম না। মুখ নিচু করে নিঃশব্দে খেয়ে নিলাম। তারপর আমরা মা-র পাশে এসে বসলাম। মা যন্ত্রণায় ছটফট করছিল। আমি দিদিকে জিজ্ঞেস করলাম, ওষুধটা দিয়েছিস ?

দিদি বলল, হ্যাঁ।

—তাহলে এখনি সব ঠিক হয়ে যাবে।

সত্যি তাই হল। একটু পরে মার যন্ত্রণা কমে গেল। মা আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়ল। কিন্তু এই ঘুম কতক্ষণ ? তিন-চার ঘণ্টা পরে মা-র ঘুম

আবার ভেঙে যাবে। আবার যন্ত্রণায় কষ্ট পেতে থাকবে।

দিদি মা-র মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল। দিদির সারা মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ। দিদিকে আজকাল আর হাসতে দেখি না। দিদির মুখে শেষ কবে হাসি দেখেছি তা আর মনে পড়ে না। ছোট বোন মা-র পায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল। তার মুখটা ভীষণ শুকনো। ছোট বোনও আজকাল আর হাসে না। ম্লান মুখে সারা দিন ঘুরে বেড়ায়। আর মা-র মুখ সবসময় যন্ত্রণায় নীল হয়ে আছে। আমি কারও মুখের দিকে তাকাতে পারি না। খুব কষ্ট হয়। আমি মা-র ডান হাত নিজের হাতে নিয়ে বসে রইলাম। আমার চোখ সামনের জানলা দিয়ে বাইরে চলে গেল।

এই সময় ঘরের বাইরে একজন অচেনা পুরুষের গলা শুনতে পেলাম, ভিতরে কেউ আছেন ?

আমি মা-র হাত নামিয়ে রেখে বাইরে এলাম। আসতেই দেখি একটি লোক এবং একটি অপূর্ব সুন্দরী মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। লোকটির হাতে একটা চামড়ার বড় ব্যাগ। মেয়েটির হাতে কিছু নেই। একে দেখলে মনে হয় এর পিঠে নিশ্চয় একজোড়া ডানা আছে। না থেকে যায় না।

লোকটির মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কি চাই ?

উত্তরে লোকটি হেসে জানতে চাইল, আপনি নিশ্চয় চানাচুর খেতে ভালোবাসেন ?

—বাসি।

—আমাদের কোম্পানি একটা নতুন ধরনের চানাচুর বাজারে ছেড়েছে। এই চানাচুরের নাম, 'খোকা চানাচুর'। এই চানাচুর আসল ঘিয়ে ভাজা। এই চানাচুর চিবোতে হয় না। মুখে দিলেই মিলিয়ে যায়। দুশো গ্রাম প্যাকেটের দাম ছ টাকা। প্রতি প্যাকেটের সঙ্গে আমরা একটা স্টেনলেস স্টিলের চামচ গিফট দিচ্ছি। দু প্যাকেট নিলে একটা স্টেনলেস স্টিলের বাটি গিফট দিচ্ছি। তিন প্যাকেট নিলে আপনি এই সুন্দরী তরুণীর গালে গিফট হিসেবে একটা চুমু খেতে পাবেন। ছটা নিলে দুটো চুমু খেতে পাবেন আর কুড়িটা নিলে···আমি অধীর আগ্রহে জিজ্ঞেস করলাম, বলুন, কুড়িটা নিলে কি হবে ? লোকটি হেসে বলল, কুড়িটা নিলে আপনি দু ঘণ্টা এই অপূর্ব সুন্দরী নারীর সঙ্গ পাবেন।

এই সুন্দরীর জন্যে কুড়ি প্যাকেট কেন দুশো প্যাকেট চানাচুর কেনা যায়।

আমি বললাম, আপনি আমায় কুড়ি প্যাকেট চানাচুর দিন।

লোকটি ব্যাগ থেকে কুড়ি প্যাকেট চানাচুর বের করে আমার হাতে তুলে দিল। আমি প্যাকেটগুলো টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে দাম মিটিয়ে দিলাম।

লোকটি এবার মেয়েটির উদ্দেশে বলল, তুমি তাহলে দু ঘণ্টা পরে অফিসে চলে এস। এক মুহূর্ত দেরি করো না।

আমি জানতে চাইলাম, আপনাদের অফিস কোথায়?

টালিগঞ্জে।—বলেই লোকটা আর দাঁড়াল না। চলে গেল।

আমি মেয়েটিকে তখন নিজের ঘরে এনে বসালাম। বসিয়ে জামা-প্যান্ট পরে মা-র কাছে গেলাম। মা-র এখন কথা বলার ক্ষমতা নেই। মা আমার দিকে ম্লান চোখ তুলে তাকিয়ে রইল।

দিদিকে বললাম, আমি একটু বেরোচ্ছি।

দিদি চিন্তিত মুখে জিজ্ঞেস করল, কোথায় যাচ্ছিস?

উত্তরে মিথ্যে কথা বললাম, একটা জরুরি কাজে। ঘণ্টা দুয়েক পরে ফিরে আসব। কিছু ভাবিস না।

ছোট বোন অভিযোগের সুরে বলল, তোর কি না গেলে চলবে না?

বললাম, না।

এর পর এই মন খারাপ করা বিষণ্ণ পরিবেশে সময় নষ্ট না করে মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। রাস্তায় পা দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার নাম কি?

মেয়েটি বলল, টিনা।

টিনা! আমি চমকে উঠলাম। মেয়েদের কি আজকাল টিনা ছাড়া অন্য নাম হচ্ছে না। সকালে একজন টিনা এসেছিল, এ বেলাতেও আর একজন টিনা! কি ব্যাপার? চারদিকে এত টিনা কেন? তবে এই টিনার তুলনা নেই।

হাঁটতে হাঁটতে আমি এক সময় টিনার হাত ধরলাম। সকালবেলার টিনার মতই এর হাতও বেশ নরম তুলতুলে। আমার ভীষণ ভালো লাগল। আমার শরীর হাল্কা হয়ে গেল। মনে হল মাটিতে আমার পা নেই। মনে হল আমার পিঠে দুটো ডানা গজিয়েছে। ইচ্ছে করলে আমি এখন যেখানে খুশি উড়ে যেতে পারি।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, তোমার ডানা আছে?

টিনা আমাকে চমকে দিয়ে অনায়াস ভঙ্গিতে বলল, আছে।

আমি উদগ্রীব হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি আমায় যেখানে খুশি উড়িয়ে নিয়ে যেতে পার ?

টিনা হাসতে হাসতে বলল, পারি। আপনি কোথায় যেতে চান ?

—এই শহর ছাড়িয়ে অনেক দূরে—কোনো পাহাড়ে, কিংবা কোনো সমুদ্রের ধারে।

—আপনি এখনি যাবেন ?

এই প্রশ্নের উত্তরে আমার মুখ দিয়ে কোন কথা বেরল না। মা, দিদি ও বোনের মুখ মনে পড়ে গেল। মনে পড়ে গেল, মা-র যন্ত্রণাক্লিষ্ট মুখ। মনে পড়ে গেল দিদি ও বোন ম্লান মুখে মা-র পাশে বসে আছে, আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। এদের এ অবস্থায় রেখে কি করে এখনই পাহাড়ে যাব ? সমুদ্রের ধারে যাব ?

টিনা আবার জানতে চাইল, চুপ করে আছেন কেন ? বলুন, এখনি যাবেন ?

আমি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম, না। আমি এখন বাড়ি যাব।

কারণ অজ্ঞাত

পাঁচুর রাগ এখনো পড়ল না। দুদিন হয়ে গেল। এখনো রাগে তার চোখমুখ লাল হয়ে আছে। কারো সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলছে না। কেউ কিছু জিজ্ঞেস করতে গেলে আরো রেগে যাচ্ছে। ফলে সবাই ভয়ে চুপ করে থাকল। কিন্তু এভাবে কদিন চলে? তাই তিনদিনের দিন পাঁচুর মা আর চুপ করে থাকতে পারল না। সকালবেলা পাঁচুর বউকে জিজ্ঞেস করল, কি ব্যাপার বলতো বউমা?

পাঁচুর বউ বলল, কিছু বুঝতে পারছি না মা।

—তুমি কিছু জিজ্ঞেস করনি?

—না।

—কেন?

—ভয় করে।

—তোমার সঙ্গে কোন কথা বলে না?

—না।

পাঁচুর মা তখন পাঁচুর বাবাকে জিজ্ঞেস করল, ছেলের কি হল?

পাঁচুর বাবা বলল, কি করে বলব?

—তুমি একবার জিজ্ঞেস কর না।

—আমি। আমি পারব না। তোমার যদি দরকার থাকে তুমি জিজ্ঞেস কর।

—আমি কেন? তুমি বাবা, তুমি জিজ্ঞেস করবে।

—আমি নয় বাবা, কিন্তু তুমি তো মা। তুমি ওকে পেটে ধরেছিলে। তোমারই জিজ্ঞেস করা উচিত।

—জিজ্ঞেস করতাম, কিন্তু আমার ভয় করছে।

—কিসের ভয়?

—জিজ্ঞেস করতে গিয়ে যদি একটা কাণ্ড কিছু করে বসে।

—তাহলে থাক, অপেক্ষা কর।

—আর কত অপেক্ষা করব। দুদিন যে হয়ে গেল। রাগ তো একটুও

পড়ল না।

—আরো দুদিন দেখ।

—আরো দুদিন। আমার কিন্তু লক্ষণ ভালো ঠেকছে না।

এদিকে পাঁচু এই রাগ নিয়েও সেদিন যথারীতি বাজারে গেল, মাছ কিনল, তরিতরকারি কিনল। কোন অসুবিধে হল না। দোকানদাররা তাকে ছেলেবেলা থেকেই চেনে। তারাও পাঁচুর চোখমুখের চেহারা দেখে দুদিন চিন্তায় ছিল, আজ কিন্তু ঘাবড়ে গেল। তবে তারা কোন কথা তাকে জিজ্ঞেস করল না। বেলায় বেচাকেনা সেরে নিজেদের মধ্যে নানা কথা বলাবলি করতে লাগল।

মাছওয়ালা আলুওয়ালাকে জিজ্ঞেস করল, পাঁচুবাবুর কি হয়েছে?

আলুওয়ালা বলল, বোঝা যাচ্ছে না। দুদিন হয়ে গেল।

পেঁয়াজওয়ালা বলল, বাড়িতে বোধহয় গোলমাল চলছে।

মাছওয়ালা বলল, কার সঙ্গে গোলমাল হবে? ভাইরা তো কেউ এ বাড়িতে থাকে না।

পেঁয়াজওয়ালা বলল, বাবা-মার সঙ্গে হতে পারে, বউয়ের সঙ্গে হতে পারে।

পাঁচুর রাগের কথা অফিসেও ছড়িয়ে পড়েছিল। কারণ কদিন ধরে পাঁচুর মুখে কেউ হাসি দেখেনি। পাঁচু সবসময় গম্ভীর। কারো সঙ্গে ভুল করেও কোন কথা বলেনি। শুধু চোখমুখ লাল করে বসে থেকেছে। আর থেকে থেকে একটার পর একটা সিগারেট ধরিয়েছে, ফেলে দিয়েছে।

অফিসের বড়কর্তার কানেও কথাটা পেঁছেছিল। দুদিন কিছু তিনি জিজ্ঞেস করেননি। সেদিন আর থাকতে পারলেন না। পাঁচু সেদিন অফিসে পেঁছতে না পেঁছতে তিনি তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, কি হয়েছে আপনার? এত রেগে আছেন কেন?

পাঁচু এতে আরো রেগে গেল। রেগে গিয়ে কথার উত্তর না দিয়ে চলে এল। এরপর বড়কর্তা আর তাকে ঘাঁটালেন না।

অফিসের বন্ধুরা দুদিন দূরে দূরে ছিল। সেদিন আর দূরে থাকতে পারল না। একে একে সবাই পাঁচুর কাছে এল।

একজন জিজ্ঞেস করল, কি হয়েছে?

আর একজন জিজ্ঞেস করল, বউয়ের সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে?

অন্য একজন জিজ্ঞেস করল, বড়কর্তা কিছু বলেছে ?

পাঁচু কারো কথার জবাব না দিয়ে নিজের কাজ করতে লাগল। বন্ধুরাও কোন উত্তর না পেয়ে একে একে চলে গেল। কিছু বুঝতে পারল না। শুধু নিজেদের মধ্যে এইসব কথা বলাবলি করতে লাগল :

—নিশ্চয় কিছু হয়েছে !

—সে তো বটেই।

—কি সেটা ?

—আমাদের ওপর রাগ করেনি তো ?

—কিছু বোঝা যাচ্ছে না।

পাঁচু রোজ সন্ধেবেলা বাড়ি ফিরে জলখাবার খায়। চা খায়। তারপর পাড়ার ক্লাবে গিয়ে তাস খেলে, দাবা খেলে। সেদিনও পাঁচু রাগ নিয়েই ক্লাবে গেল। তবে গত দুদিনের মত কারো সঙ্গে তাস খেলল না, দাবা খেলল না। বসে বসে শুধু সিগারেট খেল। সবাই দেখল, পাঁচুর রাগ আজকেও পড়েনি। দুদিন ধরে যেমন রেগে ছিল, তেমনই রেগে আছে।

ক্লাবের বন্ধুদের একজন জিজ্ঞেস করল, কি ব্যাপার ? এত রাগ কেন ?

আর একজন জিজ্ঞেস করল, অফিসে ঝামেলা হয়েছে ?

পাঁচু কথার উত্তর না দিয়ে তাদের দিকে এমন কটমট করে তাকাল যে তারা ভয় পেয়ে গেল। আর কিছু জিজ্ঞেস করতে পারল না। তবে আড়ালে তারা এরকম কথা বলাবলি করতে লাগল :

—নিশ্চয় অফিসে কিছু হয়েছে।

—অফিসে নয়, বাড়িতে। কারণ অফিসের ব্যাপার হলে কিছু না কিছু বলত। বাড়ির ব্যাপার বলে কিছু বলতে পারছে না, চুপ করে আছে।

—নাকি আমাদের ওপর চটে আছে।

—চটতেও পারে।

পাঁচু সেদিনও রাত্রিবেলা ঠিক সময়ে বাড়ি ফিরল, খাবার খেল, শুয়ে পড়ল। বউ পাশে ঘুমোতে এসে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল, কি হয়েছে ? এমন করছ কেন ?

পাঁচু কথার উত্তর না দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

পরদিনও পাঁচুর কোন পরিবর্তন হল না। তেমনি গম্ভীর মুখ, শুধু চোখ দুটো যেন আরো লাল। এই চোখমুখ নিয়েই সে চা খেল, বাজার গেল।

পাঁচু এক মাছওয়ালার কাছ থেকে রোজ পাঁচশ গ্রাম মাছ কেনে। মাছ-ওয়ালা রোজ তাকে একশ গ্রাম মাছ কম দেয়। কোনদিন আবার দামও বেশি নেয়। আজ কেন যেন মাছওয়ালা পাঁচুর মুখের দিকে তাকিয়ে বেশ ভয় পেয়ে গেল। ঠিক ওজন করল, ঠিক দাম নিল। আর ভাবল, এতকাল সে অন্যায় করেছে। পাঁচুবাবুকে সে আর জীবনে ঠকাবে না। আলুওয়ালা, পটল-ওয়ালারাও তাকে আজ ঠকাতে সাহস করল না।

পাঁচুর মুখের দিকে তাকিয়ে আজ তার বাবা-মারও বুক শুকিয়ে গেল। ভাবল আজ বোধহয় কোন অঘটন ঘটবে। কিন্তু পাঁচুর সামনে এসে দাঁড়াতে সাহস করল না। নিজেদের ঘরে ঢুকে ফিসফিস করে বলাবলি করতে লাগল:

—আজ চোখ-মুখের চেহারা দেখলে?

—দেখলাম তো?

—কি ভয়ংকর হয়েছে।

—গতকাল এতটা ছিল না।

—আজ আর মুখের দিকে তাকানো যাচ্ছে না।

—আমাদেরই ওপর বোধহয় রেগে গেছে।

—কেন?

—তুমি মেজছেলের কাছে আছ, অথচ দুদিন অন্তর বড় ছেলের বাড়ি ছুটছ। বড় বউকে এটা দিচ্ছ, সেটা দিচ্ছ। কিন্তু আজ পর্যন্ত মেজ বউকে কি দিয়েছ? উল্টে পান থেকে চুন খসলে বাড়ি মাথায় করছ।

—বড়র অবস্থা খারাপ তাই করি।

—শুধু তাই না, তোমার দেড় কাঠা জমিটাও বড়কে দিয়ে দিলে! কেন দিলে? পাঁচুর কি অপরাধ ছিল? পাঁচু তোমার ছেলে নয়?

—দেড় কাঠা জমির কি ভাগ করব। আর তুমিও তো কম যাও না। তোমার যত গয়নাগাঁটি সব যে লুকিয়ে ছোটছেলের বউকে পাচার করে দিলে! একবারও তো পাঁচুর বউয়ের কথা ভাবলে না! এখন যত দোষ আমার!

—সত্যি, অন্যায় হয়েছে।

পাঁচুর বউও ভাবল পাঁচু বোধহয় তার ওপরেই রেগে আছে। রাগারই কথা। সে এখনো বিনুকে ভুলতে পারেনি। সে এখানো বিনুকে ভালোবাসে। মাঝে মাঝে বিনুর কাছে যায়। সে পাঁচুকে বিয়ে করেছে ঠিকই, কিন্তু বিনুকে ছাড়তে পারেনি। তার থেকে থেকে বিনুর কথা মনে পড়ে, বিনুর জন্যে

কষ্ট হয়। সে তাই সময় পেলেই বিনুর কাছে চলে যায়। বিনুও মাঝে মাঝে এখানে আসে, তবে এমন সময় আসে যখন বাড়িতে কেউ থাকে না। কিন্তু কদিন আগে সে ধরা পড়ে গিয়েছে। পাঁচু সেদিন সকাল সকাল অফিস থেকে বাড়ি ফিরেছিল। ফিরে বিনুকে দেখল। দেখে কিছুই বলল না অবশ্য। চুপ করেই থাকল। তবে পাঁচুর বউ ভয়ে কাঁপতে লাগল। আজও সে ভয় যায় নি। তার ভয় কখন কোন কথায় বিনুর প্রসঙ্গ উঠে পড়ে। সে ঠিক করল আর কোনদিন বিনুর কাছে যাবে না। বিনুকে এখানে আসতে বলবে না। বিনুর সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকিয়ে দেবে। পাঁচু তার স্বামী। এবার থেকে সে শুধু পাঁচুকেই ভালোবাসবে। জীবনে এই প্রথম সে স্বামীর কথা ভাবল। স্বামীর জন্যে কষ্ট পেল।

পাঁচুর অফিসেও পাঁচুর চোখমুখ দেখে সবাই আজ আতঙ্কিত হয়ে পড়ল। গতকাল কেউ কেউ তার কাছে এসেছিল, নানা কথা জিজ্ঞেস করেছিল। আজ আর তাদের সে সাহসটুকুও হল না। বড়কর্তাও পাঁচুকে দেখে ভাবল, কি হল পঞ্চাননের? খুবই রেগে গেছে দেখছি। অবশ্য রাগ হওয়া স্বাভাবিক। কারণ প্রোমোশনটা পঞ্চাননেরই হওয়া উচিত ছিল। অথচ পঞ্চাননের প্রোমোশন হল না, হল শিবপ্রসাদের। শিবপ্রসাদ ছেলেটি বড় ভাল। মাঝে মাঝে বাড়িতে ইলিশ মাছ নিয়ে গিয়ে বলে, দাদা, ভাল ইলিশ পেলাম, নিয়ে এলাম। একবার হাঁটু পর্যন্ত জল ভেঙে দশটা জ্যান্ত বড় ট্যাংরা নিয়ে এসেছিল। মাঝে মাঝে আবার মদের বিলও মেটায়। শুধু তাই নয়, তার মেয়ের বিয়েতে রঙিন টিভি প্রেজেন্ট করেছিল। বড় ভাল ছেলে শিবপ্রসাদ। পঞ্চানন এসব কিছু করে না। তবে কাজ জানে। শিবপ্রসাদের চেয়ে বেশিই জানে। নাঃ। পঞ্চাননের জন্যে কিছু করা দরকার, নইলে বড় খারাপ দেখায়।

অফিসের বন্ধুরা আড়ালে এইসব কথা বলাবলি করতে লাগল:

—আমাদের ওপর পাঁচু খুব রেগে আছে।

—রাগারই কথা। সেদিন বড় বাড়াবাড়ি হয়ে গিয়েছিল।

—বাড়াবাড়ি আবার কি! মিছিলে যাবে না কেন?

—শরীর খারাপ থাকলে কি করে যাবে?

—মোটেই শরীর খারাপ ছিল না। আসলে ওটা একটা অজুহাত।

—না রে, শরীর খারাপ ছিল, আমি জানি।

—ঠিক আছে, সেদিন নয় শরীর খারাপ ছিল, ও তো আমাদের কোন

মিছিলেই যায় না। এমনকি কোন মিটিং-এও আসে না।

—না আসুক। ও কিন্তু চাঁদা দিয়ে যায়।

—ও সকলকেই চাঁদা দেয়।

—বাজে কথা। ও আর কাউকে চাঁদা দেয় না।

—দেয়।

—তাদের মিছিলে যায়? মিটিং-এ যায়?

—তা যায় না। মানে আমি দেখিনি কোনদিন। হয়ত খুব ধূর্ত।

—ধূর্ত! একেবারেই গোবেচারা।

—জানি না।

—যাই বল, সেদিন ওর ওপর ওভাবে হামলা করাটা আমার ভাল লাগেনি।

অফিস ছুটির পর সন্ধেবেলা পাঁচু যথারীতি বাড়ি ফিরল। নীরবে জল-খাবার খেল, চা খেল। তারপর পাড়ার ক্লাবে গেল। তবু তার মুখে হাসি ফুটল না। সকালের সেই একই রাগী মুখ নিয়ে গতদিনের মতই চুপচাপ বসে রইল। বসে বসে কেবল সিগারেট খেল। কারো সঙ্গে একটা কথাও বলল না। এমনকি কারো দিকে ফিরেও তাকাল না। দু-একজন তার কাছে ঘেঁষার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সে তাদের দিকে এমন করে তাকাল যে তারা ভয় পেয়ে গেল। তারা আড়ালে এই রকম আলোচনা করতে লাগল:

—পাঁচু মনে হয় আমাদের ওপরেই রেগে আছে।

—কেন?

—কেন তা জানো না! তোমরা এবার পাঁচুকে সেক্রেটারি না করে বিজুকে করলে, কেন করলে?

—আমাদের ক্লাবের এখন টাকার দরকার। বিজুর টাকা আছে, তাই করেছি। পাঁচু সেক্রেটারি হলে কি লাভ হত?

—কিন্তু বিজু লোকটা তো ভালো নয়।

—আমরা আর ভালো লোক চাই না। টাকাওয়ালা লোক চাই।

—তা তোমরা পেয়েছ। কিন্তু কাজটা ভালো করনি।

—তিন বছর দেখা যাক।

—সামনের বার আমরা পাঁচুকেই সেক্রেটারি করব।

ক্লাব থেকে রাত্রিবেলা বাড়ি ফিরেও পাঁচু কারোর সঙ্গে কথা বলল না।

খেয়ে দেয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল। বউ সে সময় তার গায়ে একবার হাত রাখতে গিয়েছিল। পাঁচু এক ঝটকায় সে হাত সরিয়ে দিল।

পরদিন ছিল রবিবার। পাঁচু যথারীতি ঘুম থেকে উঠল, চা খেল, বাজার করল। কিন্তু তার মধ্যে কোন পরিবর্তন এল না। সে যেন আরো ভয়ংকর চোখমুখ নিয়ে নিজের ঘরে বসে রইল। কারো সঙ্গে একটা কথাও বলল না। বাড়ির সবাই এবার ভাবল, আর চুপ করে বসে থাকা ঠিক হবে না। সকলকে খবর দেওয়া উচিত। তারা সবাই আসুক, পাঁচুকে দেখুক, যা করার করুক। পাঁচুর বাবা তাই আর দেরি না করে তার অন্য দুই ছেলেকে ফোন করল, এক ভাইকে ফোন করল ও শ্যালককে ফোন করল। পাঁচুর বউও বসে রইল না। বাপের বাড়িতে ফোন করল।

ফোন পেয়ে সবার আগে এল পাঁচুর বড় ভাই। তারপর এল ছোট ভাই। দুজনেই সঙ্গে করে বউ আনল। কিন্তু বউরা ভয়ে পাঁচুর ঘরে ঢুকল না। শ্বশুর শাশুড়ির সঙ্গে গল্প করতে লাগল। আর দুই ভাই পাঁচুর ঘরে ঢুকে কি করবে বা কি বলবে বুঝতে পারল না। কারণ পাঁচু তাদের দিকে একবার ফিরেও তাকাল না। তবু সাহস করে তারা যখন পাঁচুর বিছানায় বসতে গেল তখন পাঁচু তাদের দিকে দাঁত মুখ খিঁচিয়ে এমন শব্দ করে উঠল যে তারা ভয়ে ছিটকে গেল। তারা তখন কোন রকমে এ-ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বাবা-মার ঘরে ঢুকল।

বড় ভাই বলল, এ একেবারে উন্মাদের লক্ষণ।

পাঁচুর বাবা বলল, আমাদেরও তাই মনে হচ্ছে।

পাঁচুর বউ জিজ্ঞেস করল, কি হবে তাহলে?

ছোট ভাই বলল, ডাক্তার দেখাতে হবে।

বড় ভাই বলল, মেন্টাল হসপিটালে নিয়ে যেতে হবে।

পাঁচুর মা বলল, তুই একটু ব্যবস্থা করে দে।

বড় ভাই বলল, কিন্তু আমার যে একদম সময় নেই।

পাঁচুর মা তখন ছোটছেলেকে বলল, তোর সময় আছে?

ছোট ভাই বলল, আমারো ঐ এক অবস্থা।

পাঁচুর মা চিন্তায় পড়ে গেল, তাহলে কি হবে?

এ প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে দুই ভাই চলে গেল। যেতে যেতে বড় বউ ফিসফিস করে স্বামীকে বলল, তুমি ভুলেও এর মধ্যে মাথা গলিও না। ওরা

যা করার করবে।

বড় ভাই হেসে বলল, সে আর বলতে হবে না।

—বলা যায় না। তুমি যা বোকা!

—বোকা হতে পারি। তবে যতটা ভাব, ততটা নই।

ছোট বউও যেতে যেতে তার স্বামীকে বলল, আমার তো আজ বুক ঢিপ-ঢিপ করছিল।

—কেন?

—পাছে মা টাকা চেয়ে বসে।

—যাক্ তাহলে ভালোই হয়েছে। চাইলে একটা মিথ্যে কথা বলতে হত।

দুপুরে এল পাঁচুর কাকা ও কাকিমা। তারা দুজনেই পাঁচুর ঘরে ঢুকে একটু বসতে গিয়েছিল। কিন্তু পাঁচু তাদের দিকে তাকিয়ে এমনভাবে হাত-পা ছুঁড়তে লাগল যে তারা ঘাবড়ে গেল। কোনরকমে সে ঘর থেকে পালিয়ে এসে বাঁচল।

পাঁচুর কাকা বলল, হ্যাঁ, পাগলই হয়েছে।

পাঁচুর বাবা বলল, ছেলেরাও তাই বলছে।

পাঁচুর কাকা বলল, মেন্টাল হসপিটালে দিয়ে দাও।

পাঁচুর বাবা বলল, তাই দেব। কিন্তু অনেক টাকা লাগবে।

তারপর তারা দুজনে দেশের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করতে লাগল।

একজন বলল, আজকেও দুটো খুন হয়েছে।

আর একজন বলল, রাজনৈতিক খুন।

একজন বলল, শিগগির গৃহযুদ্ধ বাধবে।

আর একজন বলল, আমারো তাই মনে হচ্ছে।

এইভাবে বিকেল কেটে গেল। পাঁচুর কাকা ও কাকিমার সিনেমার টিকিট কাটা ছিল। তারা আর দেরি না করে সিনেমা দেখতে চলে গেল।

সন্ধেবেলা পাঁচুর মামা আর মামী এল। কিন্তু তারা পাঁচুর ঘরে ঢুকতেই পারল না। পাঁচু তাদের দেখেই এমন চিৎকার করে উঠল যে তারা ভয় পেয়ে গেল। তারা পাঁচুর বাবা-মার ঘরে ঢুকে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

পাঁচুর মামা পাঁচুর বাবাকে বলল, এ তো একেবারেই ক্ষিপ্ত হয়ে গেছে।

পাঁচুর মামী বলল, আর একটু হলে আমাদের কামড়ে দিত। আর ওকে

ঘরে রাখা উচিত নয়।

পাঁচুর বাবা বলল, ভাবছি হাসপাতালে পাঠিয়ে দেব। কিন্তু কোন হাসপাতালে পাঠাব ?

পাঁচুর মামা বলল, কেন! লুম্বিনী পার্কে।

পাঁচুর মা জিজ্ঞেস করল, ভাল হবে ?

পাঁচুর মামা বলল, নিশ্চয় ভাল হবে। চিন্তার কিছু নেই। ওখানে আমার এক জানাশুনো ডাক্তার আছে।

পাঁচুর বাবা বলল, তাহলে খুব ভালো হয়। তুমি একটু যোগাযোগ কর।

পাঁচুর মামা বলল, হ্যাঁ, আমি কালই যোগাযোগ করব।

পাঁচুর মা বলল, তুই ভুলে যাবি না তো।

পাঁচুর মামী বলল, আমি মনে করিয়ে দেব।

পাঁচুর মামা ও মামী চলে গেল। তারপর এল শ্যালক। শ্বশুর-শাশুড়ি আসতে পারল না। কারণ শ্বশুরের হাঁপানির টান উঠেছে।

শ্যালক সব দেখে শুনে দিদিকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গেল। জিজ্ঞেসকরল:

—কথাটথা বলে ?

—না।

—একদম না ?

—একদম না। সারাদিন চুপচাপ।

—এটা ভালো না। ছেলেবেলায় আমরা টেনিসনের একটা কবিতা পড়েছিলাম। তুইও পড়েছিলি। মনে আছে কবিতাটা ?

—আছে।

—কবিতাটার নাম ভুলে গেছি।

—হোম দে ব্রট হার...

—হ্যাঁ, মনে পড়েছে। জামাইবাবুর ওই বউটির মত অবস্থা হয়েছে। স্বামীর মৃত্যুতে বউটি এরকম চুপ হয়ে গিয়েছিল। তারপর পাড়াপ্রতিবেশীরা তাকে কাঁদানোর জন্যে কত চেষ্টাই না করেছিল। শেষে...আমার মনে হয় জামাইবাবুকে ওরকম একটা কিছু...

—কিন্তু তোর জামাইবাবু তো কোন শক পায়নি।

—নিশ্চয় পেয়েছে। নইলে এত চুপচাপ হয়ে যাবে কেন ? আমার মতে তোরা জামাইবুকে কাঁদাবার চেষ্টা কর। একবার কাঁদলে সব ঠিক হয়ে যাবে।

—কিন্তু কিভাবে কাঁদাব ?

—নিজেরা কেঁদে। তোরা জামাইবাবুর সামনে গিয়ে দল বেঁধে হাউহাউ করে কাঁদতে থাক। তোদের দেখাদেখি জামাইবাবুও কেঁদে ফেলবে। কারণ কান্না বড় ছোঁয়াচে।

—কিন্তু আমরা কাঁদব কি করে ?

—খুব দুঃখের দৃশ্য ভাববি। ভাবতে ভাবতে ঠিক এক সময় কান্না পেয়ে যাবে। তবে নিঃশব্দে কাঁদলে চলবে না। জোকার দিয়ে কাঁদতে হবে।

পাঁচুর শ্যালক চলে গেল। যেতেই পাঁচুর বউ শ্বশুর শাশুড়ির কাছে গিয়ে ভাই যা বলে গেছে তা বলল।

পাঁচুর বাবা শুনে বলল, কথাটা মন্দ বলেনি।

পাঁচুর মা বলল, তাহলে তাই কর। তা কখন কাঁদতে হবে ?

পাঁচুর বাবা বলল, আজ থাক। কাল সকালে দেখা যাবে। তা, তোমরা কাঁদতে পারবে তো ?

পাঁচুর মা বলল, খুব।

পাঁচুর বউও বলল, খুব।

পাঁচুর বাবা বলল, তবে আরো লোক জোগাড় করতে পারলে ভালো হত।

পাঁচুর মা জিজ্ঞেস করল, লোক মানে ? মেয়েছেলে ?

পাঁচুর বাবা বলল, হ্যাঁ। কারণ মেয়েরা ভালো কাঁদতে পারে।

পাঁচুর মা জিজ্ঞেস করল, আর কতজন চাই ?

পাঁচুর বাবা বলল, তোমরা দুজন আছ। এছাড়া আর চার-পাঁচজন হলেই হবে। তবে, তুমি তো একাই একশ।

পাঁচুর মা বিরক্ত হয়ে বলল, এখন ইয়ার্কি রাখ।

পরদিন সকালে পাঁচু যথারীতি ঘুম থেকে উঠল, চা খেল, বাজার করল। তারপর ঘরে এসে বসল। আর ঠিক তখনই প্রায় হুড়মুড় করে তার ঘরের ভিতর মা ঢুকল, বউ ঢুকল, পাশের বাড়ির দীপুর মা ঢুকল, জবার মা ঢুকল। এছাড়া আরো অনেকে ঢুকল। পাঁচু দাঁতমুখ খিঁচিয়ে তাদের দিকে তাকাল। তারা কেউ সেসব গ্রাহ্য করল না। তারা সবাই পাঁচুর সামনে এসে বসল।

পাঁচুর মা দীপুর মাকে আস্তে করে বলল, এবার শুরু করুন দিদি।

দীপুর মা তখন জোকার দিয়ে উঠল, ওরে আমায় কি হবে রে…

সঙ্গে সঙ্গে বাকিরাও জোকার দিয়ে কাঁদতে শুরু করল।

পাঁচু প্রথমে হকচকিয়ে গেল। তারপর পরিস্থিতিটা বুঝে হো হো করে গলা ফাটিয়ে হাসতে লাগল। তার এই প্রবল হাসির শব্দে সকলের কান্না থেমে গেল। পাঁচু তখন তার বউকে বলল, আমাকে খেতে দাও। ভীষণ খিদে পেয়েছে।

এ কথায় সকলেই আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল, কথা বলেছে, কথা বলেছে।

পাঁচু তারপর স্নান করল, ভাত খেল, অফিস গেল। তার মুখে আবার সেই আগের হাসি ফিরে এল। সবাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

কিন্তু পরদিন মাছওয়ালা আবার পাঁচুকে ওজনে ঠকাল। পাঁচুর বাবা আবার লুকিয়ে বড় ছেলের বউকে একটা মিক্সার কিনে দিল। পাঁচুর মা আবার লুকিয়ে ছোট ছেলের বউকে একটা আংটি দিয়ে এল। পাঁচুর বউও আবার বিনুর কাছে ছুটল। অফিসে ও ক্লাবেও আগে যেমন চলছিল, তেমনিই চলতে লাগল। এমনকি অফিসের বড়কর্তাও পাঁচুর প্রমোশনের কথা বেমালুম ভুলে গেলেন।

সব আবার স্বাভাবিক হয়ে গেল। কিন্তু পাঁচুর কি হয়েছিল তা কেউ জানতে পারল না।

ক্যাপসুল

শেষ পর্যন্ত বকুর বাবা সর্দি'জ্বরে মারা গেল। সর্দি'জ্বরে কেউ মারা যায় না। কটা ক্যাপসুল খেলেই ভাল হয়ে যায়। বকুও ডাক্তারবাবুর কথামত বাবাকে ক্যাপসুল খাইয়েছিল। অথচ তার বাবা মরে গেল। কিছুতেই বাবাকে বাঁচাতে পারল না। বকুর খুব মন খারাপ হয়ে গেল। কারণ, সংসারে তার বাবা ছাড়া কেউ ছিল না। সে বাবাকে ভীষণ ভালোবাসত। এত ভালোবাসত যে বাবার দুঃখে কয়েক মাস ভাল করে ঘুমোতে পর্যন্ত পারল না। রোজ শুয়ে শুয়ে ভগবানের উদ্দেশে একটা কথাই বলতে লাগল, ভগবান! তুমি একী করলে।

একদিন সেকথা ভগবানের কানে গেল। ভগবান খুব ব্যস্ত লোক। তিনি বকুর সঙ্গে দেখা করতে পারলেন না। তার বদলে দেবদূতকে পাঠিয়ে দিলেন। দেবদূত বকুর ঘরে ঢুকে বললেন, আমি ভগবানের কাছ থেকে আসছি।

বকু জিজ্ঞেস করল, আপনি কে?

—দেবদূত।

বকু চমকে উঠল, দেবদূত!

—হ্যাঁ।

—আমার কী সৌভাগ্য! বসুন, বসুন।

—না, বসব না।

—এক কাপ চা খান।

—আমি চা খাই না।

—সিগারেট?

—আমি সিগারেট খাই না।

—তাহলে কী খাবেন বলুন। দুটো সন্দেশ আনি।

—আমি কিছু খেতে এখানে আসিনি। বিশেষ কাজে এসেছি।

—কী কাজ?

—আপনি রোজ ভগবানকে জ্বালাতন করছেন কেন?

বকু দেবদূতের এই প্রশ্নে থতমত খেয়ে বলল, আমি। কবে? কখন?

দেবদূত বললেন, বাহ! ভুলে গেলেন! আপনি রোজ রাত্রিবেলা ভগবানের উদ্দেশে বলছেন: ভগবান! তুমি আমার একী করলে? বলছেন না?

—তা বলছি।

—কেন বলছেন?

—আমার বাবা কেন মারা গেল তা ভগবানের কাছে জানতে চাইব না?

—তা চাইতে পারেন। কিন্তু আপনার বাবার মৃত্যুর ব্যাপারে ভগবানের কোন হাত নেই।

—কার হাত আছে?

—শয়তানের।

—কিভাবে?

—আপনি বাবাকে যে ক্যাপসুল দিয়েছেন তা শয়তানের তৈরি। ঐ ক্যাপসুলের ভিতরে কোন ওষুধ নেই, আছে বিষাক্ত পোকা।

বকু চমকে উঠল, বিষাক্ত পোকা!

—হ্যাঁ, বিষাক্ত পোকা। বিশ্বাস না হয় ক্যাপসুল খুলে দেখুন। এখনো তো শিশিতে কয়েকটা ক্যাপসুল পড়ে আছে।

দেবদূত সব জানেন। সত্যি, শিশিতে এখনো কয়েকটা ক্যাপসুল পড়ে আছে। বকু তাড়াতাড়ি শিশি থেকে একটা ক্যাপসুল বের করল। খুলে দেখল। তারপর আর একটা ক্যাপসুল বের করল। খুলে দেখল। ঠিকই বলেছেন দেবদূত। ক্যাপসুলের ভিতরে কোন ওষুধ নেই, তার বদলে পোকা আছে। বকু এবার বুঝতে পারল কেন বাবা সর্দিজ্বর থেকে সেরে উঠল না। কেন বাবা মারা গেল। বকুর মাথায় রক্ত উঠে গেল। তার সারা শরীর রাগে রি রি করতে লাগল। তার ইচ্ছে হল এখনি শয়তানের কলার চেপে ধরে, তার পিঠের ছাল তুলে দেয়। ইচ্ছে হল এখনি তাকে ফাঁসিতে ঝোলায়, কিংবা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়। কিন্তু শয়তানকে সাজা দিতে হলে ক্ষমতার দরকার। বকুর সে ক্ষমতা নেই। বকু হতভম্ব হয়ে চুপ করে রইল। বুঝতে পারল না তার এখন কী করা উচিত।

দেবদূত বকুকে সাহস দেবার জন্যে বললেন, আপনার চুপ করে থাকা উচিত নয়।

বকু জানতে চাইল, কী করব ?

দেবদূত বললেন, শয়তানকে খুঁজে বার করুন।

—তারপর ?

—তারপর শাস্তি দিন। আপনার কোন ভয় নেই। ভগবান আপনার সহায়। ধর্মের জয় হবেই।

একথায় বকু সাহস ফিরে পেল। ঠিক করল সে শয়তানকে যে করেই হোক খুঁজে বার করবে। তাকে শাস্তি দেবে। তার বাবার মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবে। কিন্তু শয়তানের কাছে একা যেতে তার ভরসা হল না। সঙ্গে একজন থাকলে ভরসা পেত।

বকু দেবদূতকে জিজ্ঞেস করল, আপনার কি কাজের তাড়া আছে ?

—কেন ?

—আপনি আমার সঙ্গে চলুন না।

—কোথায় ? শয়তানের কাছে ?

—হ্যাঁ।

—মাথা খারাপ।

—এতে মাথা খারাপের কী হল ?

—আমি ভগবানের লোক। শয়তানের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই।

—নাই বা থাকল। আপনাকে কিছু করতে হবে না। আপনি শুধু সঙ্গে থাকবেন।

দেবদূত হাত নেড়ে বললেন, না, না, আমি ওসবের মধ্যে নেই। আপনি যদি যাবার দরকার মনে করেন একা যাবেন। নইলে যাবেন না।

—আপনি সঙ্গে গেলে ক্ষতি কি।

—আমি শয়তানকে ভীষণ ভয় পাই।

একথায় বকু চুপ করে গেল। কারণ, এরপর আর দেবদূতকে অনুরোধ করা চলে না। সে বুঝতে পারল, শয়তানের কাছে তাকে একাই যেতে হবে। সঙ্গে দেবদূতকে পাবে না। কিন্তু শয়তান কোথায় থাকে তা সে জানে না। এটা দেবদূতের কাছ থেকে জেনে নেওয়া দরকার। সে বলল, ঠিক আছে, আপনাকে সঙ্গে যেতে হবে না। কিন্তু একটা উপকার করুন।

—কী ?

—শয়তানের ঠিকানাটা দিন।

—আমি ঠিকানা জানি না।

—কে জানে?

—ভগবান।

বকু এবার অনুরোধ করল, আপনি আমাকে ভগবানের কাছে নিয়ে চলুন।

—সে আমি পারব না।

—কেন?

—ভগবান এতে আমার ওপর ভীষণ চটে যাবে। আপনি বরং নিজেই শয়তানের খোঁজ করুন।

—কিভাবে করব?

—সে আমি জানি না।

বকু বুঝতে পারল, দেবদূত তাকে কোনভাবেই সাহায্য করবেন না। তখন সে তাঁকে শেষ অনুরোধ করল, আচ্ছা, শয়তানকে কেমন দেখতে? সেটা বলবেন?

দেবদূত বকুর এই অনুরোধ আর প্রত্যাখ্যান করলেন না। তিনি শয়তান সম্পর্কে যা বললেন তা সংক্ষেপে এইরকম:

শয়তানের চেহারার কোন নির্দিষ্ট রূপ নেই। সে তার ইচ্ছেমত রূপ ধারণ করে। সে কখনো মোটা এবং বেঁটে হয়। কখনো রোগা এবং লম্বা হয়। সে কখনো নারীর কখনো পুরুষের বেশ ধারণ করে। তার গায়ের রঙ কখনো ফর্সা হয়। কখনো কালো হয়। কখনো শার্ট-প্যান্ট পরে, কখনো ধুতি-পাঞ্জাবি পরে। তার বয়স কখনো তিরিশ, কখনো ষাট।

বকু সব শুনে বলল, এই শয়তানকে চেনা খুব কঠিন। ভগবানও পারবে না।

দেবদূত হেসে বললেন, ভগবান ঠিক পারবে।

—তাহলে ভগবানই শয়তানকে শাস্তি দিক।

—সে হয় না।

—কেন?

—শয়তান আপনার বাবাকে মেরেছে। আপনাকেই শাস্তি দিতে হবে।

—আর ভগবান কি বসে বসে দেখবে? তার কিছু করার নেই?

—পিছন থেকে আপনাকে উৎসাহ দেবে।

—কেন ? আমার পাশে এসে দাঁড়াতে পারবে না ?

—আগে হলে দাঁড়াত ।

—এখন কী হয়েছে ?

—এখন বয়স হয়েছে । আর পারবে না ।

—তাহলে ভগবানের বেঁচে থেকে লাভ কী ? মরে গেলেই পারে ।

একথায় দেবদূত বকুর ওপর ভীষণ চটে গেলেন । বললেন, আপনার সঙ্গে আর কথা নয় । যা মনে হয় করুন । তবে দয়া করে কথায় কথায় ভগবানের ওপর দোষারোপ করবেন না ।

বকু দেখল দেবদূত বেশ রেগে গেছেন । তাঁকে শান্ত করার জন্যে বলল, আপনি রাগ করছেন কেন ? আমার বাবা মারা গেছে । আমার কি আর মাথার ঠিক আছে । আপনি তো জানেন আমি ভগবানকে ভালোবাসি, ছেলেবেলা থেকেই ভালোবাসি ।

দেবদূত বললেন, ভালো যদি বাসেন তাহলে ভগবানের হয়ে কাজ করুন ।

—কী কাজ ?

—শয়তানকে খুঁজে বের করুন । তাকে শাস্তি দিন ।

—ঠিক আছে । তাই দেব ।

একথা শুনে দেবদূত খুশি হলেন । বললেন, তাহলে আজ চললাম । দরকার হলে আবার আসব ।

—আবার আসবেন ?

—হ্যাঁ, আবার আসব । আপনি নিশ্চিত থাকুন ।

এই বলে দেবদূত অদৃশ্য হয়ে গেলেন । কিন্তু বকু সমস্যায় পড়ে গেল । কারণ ভগবানকে লাভ করার জন্যে আদিকাল থেকে মানুষ চেষ্টা করে এসেছে । সে সম্পর্কে নানা বইও লেখা হয়েছে । কিন্তু শয়তানকে লাভ করার জন্যে কেউ কখনো চেষ্টা করেনি । ফলে কোন বইও লেখা হয়নি । তাই ভগবান সম্পর্কে একটা ধারণা মানুষের মধ্যে গড়ে উঠেছে । কিন্তু শয়তান সম্পর্কে মানুষের মধ্যে শুধু একটা ভীতি আছে । তেমন কোন স্পষ্ট ধারণা নেই । দেবদূত বকুকে শয়তান সম্পর্কে যে ধারণা দিয়ে গেলেন তাতে প্রতিটি মানুষকেই শয়তান বলে ভাবতে হয় । বকু কোন মানুষকেই শয়তান বলে ভাবে না । সে সকলকেই ভালোবাসে । শুধু একজনকে তার একদম ভালো লাগে না । সে তার বাড়িওয়ালা । বাড়িওয়ালা লোকটা যে চিরকাল

খারাপ ছিলেন তা নয়। একসময় বেশ ভালোই ছিলেন। দু'বছর হল একেবারে বদলে গেছেন। তাদের বাড়ি থেকে উৎখাত করার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছেন। অবশ্য তাঁকে খুব একটা দোষ দেওয়া যায় না। কারণ তারা ঘর ছেড়ে দিলে বাড়িওয়ালা নতুন ভাড়াটে বসাতে পারবেন। এবং তার কাছ থেকে তিনগুণ ভাড়া পাবেন। কিন্তু বকুরা যে কোথায় যাবে, তা বাড়িওয়ালা ভাবেন না। তাদের কোনরকমে উঠিয়ে দিতে পারলেই তিনি নিশ্চিন্ত। এইজন্যে তিনি তাদের দিনের পর দিন শাসিয়েই ক্ষান্ত হননি, মামলা পর্যন্ত করেছেন। এহেন বাড়িওয়ালার বন্ধু ডাক্তারবাবু, যিনি বকুর বাবার চিকিৎসা করেছেন। বাড়িওয়ালার কথায় ডাক্তারবাবু যে বকুর বাবাকে ঐ ক্যাপসুল দেননি তার প্রমাণ নেই। বকুর সমস্ত রাগ বাড়িওয়ালার ওপরে গিয়ে পড়ল। এবং তাঁকে শয়তান হিসেবে ধরে নিল।

বাড়িওয়ালা তিনতলায় থাকেন। বকু একতলা থেকে তিনতলায় উঠে গেল। ডোর বেল টিপে তাঁকে ডাকল। বাড়িওয়ালা দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন। বকু উত্তেজিত গলায় বলল, আপনি আমার বাবাকে মেরে ফেলেছেন।

এরকম আচমকা আক্রমণে বাড়িওয়ালা ঘাবড়ে গেলেন। কিছু বুঝতে না পেরে বললেন, কি বলছেন আপনি?

বকু বলল, ঠিক বলছি।

বাড়িওয়ালার বিস্ময়ের ঘোর তখনো কাটেনি। বললেন, ঠিক বলছেন?

—হ্যাঁ, ঠিক বলছি। আপনার পরামর্শে ডাক্তারবাবু বাবাকে এমন ক্যাপসুল দিয়েছেন যার ভিতরে ওষুধ ছিল না, বিষাক্ত পোকা ছিল।

—আপনার কি মাথা খারাপ?

—কেন?

—আপনি কি করে ভাবলেন যে আমি আমার বন্ধুকে এই পরামর্শ দেব?

—কারণ বাবা মরে গেলে আমাকে বাড়ি থেকে তুলে দেওয়া সহজ হবে।

—আপনি জেনে রাখুন, এতে কোন সুবিধে হয় না।

—তাহলে ডাক্তারবাবু এই বিষাক্ত পোকাভর্তি ক্যাপসুল দেবেন কেন? দিয়ে তাঁর লাভ কি?

—সে তো আমি বলতে পারব না। আপনি বরং ডাক্তারবাবুর কাছে গিয়ে কথাটা জিজ্ঞেস করুন।

—তার মানে বাবার মৃত্যুতে আপনার কোন হাত নেই?

—আমার কথা বিশ্বাস করুন। আমার কোন হাত নেই।

—ঠিক আছে, আমি ডাক্তারবাবুর কাছেই যাচ্ছি।

—হ্যাঁ, তাই যান। দেখুন, তিনি কী বলেন?

বকু বাড়িওয়ালাকে ছেড়ে দিয়ে ডাক্তারবাবুর কাছে ছুটল। সঙ্গে নিল ক্যাপসুলের শিশি। ডাক্তারবাবু তখন সবে চেম্বারে এসে বসেছেন। বকুকে দেখেই জিজ্ঞেস করলেন, কী ব্যাপার?

বকু বলল, আপনি কি ক্যাপসুল দিয়েছিলেন?

—কেন? আমি তো সবথেকে নামকরা কোম্পানির ক্যাপসুল দিয়েছিলাম।

এই আপনার ক্যাপসুল।—বলে পকেট থেকে বকু ক্যাপসুলের শিশি বের করল। তারপর ক্যাপসুল খুলে দেখাল। দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল, কী আছে এর ভিতরে?

ডাক্তারবাবু অবাক হয়ে বললেন, এ তো পোকা দেখছি। কি করে এল? সব ক্যাপসুলই কি এইরকম?

—হ্যাঁ।

—কিন্তু আমি তো কিছুই জানি না।

—তাহলে কে জানে?

—আপনি দোকানদারকে গিয়ে জিজ্ঞেস করুন।

বকু তখন ডাক্তারবাবুকে ছেড়ে দোকানদারের কাছে গিয়ে হাজির হল। বকু দোকানদারকে দেখেই জিজ্ঞেস করল, আপনার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে।

—কি কথা? বলুন।

—আপনি আমাকে চেনেন?

—হ্যাঁ।

—বাবাকে?

—হ্যাঁ। বড় ভাল লোক ছিলেন। আপনার বাবা এভাবে মারা যাবেন ভাবতেই পারিনি।

—কিন্তু বাবা মারা গেলেন। এবং আপনিই তাকে মেরে ফেললেন।

দোকানদার চমকে উঠলেন। বললেন, আমি!

—হ্যাঁ, আপনি।

—কি ভাবে ?

বকু সঙ্গে সঙ্গে ক্যাপসুল বের করে খুলে দেখাল। জিজ্ঞেস করল, দেখুন কি ক্যাপসুল আপনি দিয়েছেন।

দোকানদার খোলা ক্যাপসুলের দিকে তাকিয়ে বললেন, এ তো দেখছি পোকা।

—শুধু পোকা নয়, বিষাক্ত পোকা।

—আপনি ডাক্তারবাবুর সঙ্গে দেখা করেছিলেন ?

—করেছিলাম।

—উনি কি বললেন ?

—আপনার কাছে আসতে বললেন।

—কিন্তু এ ব্যাপারে আমার তো করার কিছু নেই। আমরা ওষুধ আনি, বিক্রি করি। ওষুধের ভিতরে কি আছে তা দেখতে যাই না।

—তার মানে আপনার কোন দোষ নেই ?

—বিশ্বাস করুন…

—তাহলে কার জন্যে বাবা মারা গেল ?

—আপনি বরং ডিলারের সঙ্গে দেখা করুন।

—আপনি তাঁর কাছ থেকে ওষুধ কেনেন ?

—হ্যাঁ।

—ঠিকানাটা দিন।

দোকানদার বকুকে ঠিকানাটা দিয়ে দিলেন। বকু ঠিকানাটা নিয়ে সেখান থেকে চলে এল।

ডিলারের কাছে যেতে যেতে বকু ভাবল, ডিলারও নিশ্চয় নিজের দোষ স্বীকার করবেন না। বাড়িওয়ালা ডাক্তারবাবুকে দেখিয়েছেন। ডাক্তারবাবু দোকানদারকে দেখিয়েছেন। দোকানদার ডিলারকে দেখিয়েছেন। এখন ডিলার কাকে দেখাবেন ? এভাবে সে কোথায় গিয়ে পৌঁছবে ? ভগবান সব জানে। তার অনুচর দেবদূতও নিশ্চয় সব জানেন ! ইচ্ছে করলেই তিনি সব বলে দিতে পারতেন। বলে দিতে পারতেন তার বাবার মৃত্যুর জন্যে দায়ী কে। আর বলে দিলে এত ঝামেলা তাকে পোহাতে হত না। সে সরাসরি তার কাছে চলে যেত। তার শাস্তির একটা ব্যবস্থা করতে পারত। কত সহজে কাজটা হত। কিন্তু দেবদূত সে পথে গেলেন না। তাকে ভগবানের কাছে নিয়ে গেলেন না পর্যন্ত।

নিয়ে গেলে তার কত ভাল হত। ভগবানকে একবার চোখে দেখতে পারত। বুঝতে পারত ভগবান কোথায় থাকে, কিভাবে থাকে। বুঝতে পারত ভগবানকে কিরকম দেখতে। বুঝতে পারত ভগবান সাকার না নিরাকার, সসীম না অসীম। বুঝতে পারত ভগবান সাদা না কালো, বেঁটে না লম্বা। আর এতেই সে খুশি হত। শয়তানের ঠিকানা না পেলেও তার কোন আফসোস থাকত না। তার মানবজন্ম সার্থক হত। দেবদূতের জন্যেই সেটা হতে পারল না। অথচ ইচ্ছে করলে দেবদূত তাকে ভগবানের কাছে নিয়ে যেতে পারতেন। কিন্তু নিয়ে গেলেন না, কারণ ভগবান রেগে যাবে। এটা একেবারেই বাজে কথা। ভগবান কখনই কারো উপর রাগ করতে পারে না। ভগবানের দয়ার শরীর; তবে তার বাবার হয়ে ভগবানের লড়াই করা উচিত ছিল। বয়সটা কোন ব্যাপার নয়। নিশ্চয় ভগবানের অন্য উদ্দেশ্য আছে। কি তা সে জানে না। দেবদূতও জানেন না বোধহয়।

এই সব নানা কথা ভাবতে ভাবতে বকু ডিলারের কাছে গিয়ে হাজির হল। বেশ বড় দোকান। বকু একজনকে জিজ্ঞেস করল, এই দোকানের মালিক আছেন?

—আছেন।

—আমি তাঁর সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই।

—কি কথা?

—ব্যক্তিগত।

লোকটা এবার বলল, ভিতরে আসুন। বকু দোকানের ভিতরে ঢুকল। লোকটা বকুকে চেয়ারে বসে থাকা মালিককে দেখিয়ে দিল। মালিক তখন একটা ফাইল খুলে বসেছিলেন। বকু তার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। মালিক ফাইল থেকে মুখ তুলে বকুর দিকে তাকালেন। জিজ্ঞেস করলেন, কি চাই?

—আমি একটা কথা আপনার কাছে জানতে এসেছি।

—কি কথা?

—আপনি আমার বাবাকে চিনতেন?

মালিক কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কি নাম আপনার বাবার?

বকু বাবার নাম বলল।

মালিক অনেক ভেবে উত্তর দিলেন, না। এই নামে কাউকে আমি চিনি না।

—মিথ্যে কথা। আপনি খুব ভালোভাবেই আমার বাবাকে চিনতেন।

মালিক একথায় রেগে গিয়ে বললেন, কি বলছেন আপনি? আমার কথা আপনার বিশ্বাস হচ্ছে না?

—না।

—কেন?

—আপনি যদি বাবাকে না চিনতেন তা হলে বাবাকে মারতে গেলেন কেন?

—আমি আপনার বাবাকে মেরেছি! কি বলতে চান আপনি?

বকু সঙ্গে সঙ্গে ক্যাপসুলবের করে খুলে দেখাল। জিজ্ঞেস করল, কি এটা?

—পোকা।

—আমার বাবা এই ক্যাপসুল খেয়েই মারা গেছে। আপনি এই ক্যাপসুলের ডিলার।

মালিক তখন আমতা আমতা করে বললেন, দেখুন, আমার কিন্তু কোন দোষ নেই।

—দোষ নেই মানে! আপনিই তো এই ক্যাপসুল বিক্রি করছেন।

—তা করছি। কিন্তু আমি তো ক্যাপসুলের ভিতর পোকা ভরিনি। আমি কোম্পানির কাছ থেকে ওষুধ কিনছি, বিক্রি করছি। ভিতরে কি আছে দেখতে যাচ্ছি না।

—তার মানে এ ব্যাপারে আপনার কোন দোষ নেই, কোন দায়িত্ব নেই।

—ঠিক। আমার কোন দোষ নেই, দায়িত্ব নেই।

—কার দোষ?

—কোম্পানির। আপনি কোম্পানিতে চলে যান। খোঁজখবর নেন।

—কোম্পানির ঠিকানাটা দিন।

মালিক আর কথা না বাড়িয়ে কোম্পানির ঠিকানা দিয়ে দিলেন। বকু ঠিকানাটা নিয়ে দোকান থেকে বেরিয়ে এল। আর তার ভাবনা নেই। এবার হয়ত তার প্রকৃত অপরাধীর সঙ্গে দেখা হবে। এবং সে হয়ত তার অপরাধ স্বীকার করবে। তখন বকু তাকে শাস্তি দেবে। অবশ্য কি শাস্তি দেবে তা সে ঠিক করেনি। তবে এসব ক্ষেত্রে বকুর ধারণা এর একমাত্র শাস্তি হওয়া উচিত মৃত্যু। এখন অবশ্য তার এ নিয়ে মাথাব্যথা নেই। এখন তার কাছে একটাই সমস্যা, প্রকৃত অপরাধীকে খুঁজে বের করা। তারপর সব অন্যান্য ভাবনা।

কোম্পানির ঠিকানা খুঁজে বের করতে বকুর অসুবিধে হল না। বিশাল এলাকা জুড়ে বাড়ি। সামনে অফিস। পিছনে ল্যাবরেটারি। এইরকম বাড়ির ভিতর ঢুকতে গিয়ে বকুর গা ছমছম করে উঠল। কেমন ভয় পেয়ে গেল। শেষে ভগবান তার পিছনে আছে ভেবে ভিতরে ঢুকে পড়ল। এক-জনকে জিজ্ঞেস করল, এই কোম্পানির মালিকের নাম কি?

সে বলল, প্রশান্ত ধর।

—তিনি আছেন এখন?

—কিছুক্ষণ হল বেরিয়েছেন।

—আমি তা হলে কার সঙ্গে কথা বলব?

—কি ব্যাপারে?

—একটা ব্যক্তিগত ব্যাপারে।

—আপনি ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করুন।

—তিনি কোথায় বসেন?

—দোতলায়।

বকু ভয়ে ভয়ে দোতলায় উঠে গেল। তার পা দুটো একটু কাঁপছিল। এক জায়গায় একটুখানি দাঁড়িয়ে সেটা ঠিক করে নিল। তারপর একজনকে দেখে জিজ্ঞেস করল, ম্যানেজার কোথায় বসেন?

সে একটা ঘর দেখিয়ে দিল।

ম্যানেজারের ঘরের সামনে একটা লোক টুলে বসে আছে। বকু তাকে জিজ্ঞেস করল, সাব আছেন।

—আছেন।

—ওঁর সঙ্গে আমি দেখা করতে চাই।

—যান।

ভগবানের নাম নিয়ে বকু ম্যানেজারের ঘরের ভিতরে ঢুকে পড়ল।

ম্যানেজার বসে একটা কি লিখছিলেন। তিনি মুখ তুলে জিজ্ঞেস করলেন, কি চাই?

বকুর মুখ শুকিয়ে গেল। সে কোনরকমে বলল, একটু বসতে পারি?

—বসুন।

বকু বসেই সরাসরি জিজ্ঞেস করল, আমার বাবা আপনার কাছে কি অপরাধ করেছিল?

ম্যানেজার চমকে উঠলেন, কে আপনার বাবা ?

বকু বাবার নাম বলল।

—ঠিকানা ?

বকু ঠিকানা বলল।

—চিনতে পারলাম না তো !

—সে কি ! চিনতে পারলেন না ! অথচ আপনারা তাকে মেরে ফেললেন ?

—আমরা মেরেছি !

—হ্যাঁ, আপনারা মেরেছেন।

—কিভাবে ?

--আমার বাবার সর্দি'জ্বর হয়েছিল।

—হতেই পারে। তারপর ?

—আপনার কোম্পানির ওষুধ বাবাকে খাইয়েছিলাম। বাবা সেই ওষুধ খেয়েই মারা গেল।

—কিন্তু আমাদের ওষুধ খেয়ে কেউ তো মরে না।

—অথচ বাবা মরে গেল। কেন জানেন ?

—কেন ?

—কারণ আপনাদের তৈরি ক্যাপসুলের ভিতর কোনও ওষুধ ছিল না।

—কি ছিল ?

—পোকা, বিষাক্ত পোকা ছিল। দেখবেন ?

—দেখি।

বকু ক্যাপসুল বের করে খুলে দেখাল। ম্যানেজার তা দেখে হো হো করে হেসে উঠলেন। বললেন, এটা পোকা নয়।

বকু এককথায় ঘাবড়ে গেল। বলল, কি বলছেন আপনি ? এটা পোকা নয় ?

—না, এটা পোকা নয়।

—এটা তাহলে কি ?

—ওষুধ।

—ওষুধ !

—হ্যাঁ, এটা ওষুধ।

—মোটেই না। এটা পোকা। আপনি দেখুন, ভাল করে দেখুন।

দেখতে পাচ্ছেন ?

—পাচ্ছি। ভালো করেই দেখতে পাচ্ছি। এটা পোকা নয়, এটা ওষুধ।

—কিসের ওষুধ ?

—সমস্ত রোগ শোক দুঃখ ও যন্ত্রণার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার ওষুধ।

—আমার বাবা তো রেহাই পেল না। মরে গেল।

—হ্যাঁ, মরে গিয়ে বেঁচে থাকার হাত থেকে রেহাই পেয়েছেন। আপনিও যদি আপনার বাবার মত রেহাই পেতে চান তাহলে আপনিও সর্দিজ্বরে এই ক্যাপসুল ব্যবহার করুন।

বকুর মুখ দিয়ে কোনও কথা সরল না। ম্যানেজারের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। বুঝতে পারল না একথার উত্তরে তার কি বলা উচিত।

ম্যানেজার বলতে লাগলেন, আপনার উচিত আমাদের এর জন্য ধন্যবাদ দেওয়া। অথচ আপনি এসেছেন অভিযোগ করতে। সত্যি, আমি এতে খুব মর্মাহত হলাম।

বকু বুঝতে পারল এর সঙ্গে কোন কথা চলে না। এ হচ্ছে শয়তান অথবা শয়তানের অনুচর। একে বাঁচিয়ে রাখার কোনও মানে হয় না। লোকটাকে এখনি গুলি করে মারা উচিত। কিন্তু গুলি করতে হলে রিভলবার চাই। তার সঙ্গে রিভলবার নেই। সে এখন কোথায় রিভলবার পাবে ? এই লোকটার কাছে থাকতে পারে। যদি থাকে চেয়ে নেবে। নিয়ে একেই গুলি করবে।

বকু শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করল, আপনার কাছে রিভলবার আছে ?

ম্যানেজার অবাক হয়ে বললেন, রিভলবার! রিভলবার কি হবে ?

—আপনাকে গুলি করব।

—আমাকে ? আমাকে কেন ? আমার অপরাধ ?

—আপনার অপরাধ আমার বাবার মৃত্যুর জন্যে আপনিই দায়ী।

—আপনার যদি তাই ধারণা হয়, তাহলে তাই করুন। এই নিন রিভলবার।

এই বলে ম্যানেজার টেবিলের ড্রয়ার টেনে একটা রিভলবার বের করে বকুকে দিল। বকু রিভলবারটা হাতে তুলে নিল। বেশ ভারী।

ম্যানেজার এইসময় বললেন, কিন্তু আমাকে মেরে কোনও লাভ হবে না।

—কারণ ?

—কারণ আমি মরে গেলে আমার জায়গায় আমারই মতো আর একজন

আসবে।

—তাকেও মারব।

—তাতেও লাভ হবে না। কারণ সে মরে গেলে তার জায়গায় তার মতো আর একজন আসবে।

—তাকেও মারব।

—এভাবে আপনি কতজনকে মারবেন? তার চেয়ে...

—তার চেয়ে কি?

—আপনি মালিককে মারুন। তাঁরই নির্দেশে সব কিছু হচ্ছে। তিনিই সব।

—কে তিনি? প্রশান্ত ধর?

—হ্যাঁ।

—তাকে এখন কোথায় পাব?

—অন্য আর একটা অফিসে পাবেন।

—সে অফিসটা কোথায়?

ম্যানেজার বকুকে সে-অফিসের ঠিকানা দিলেন। বকু ঠিকানাটা নিয়ে জিজ্ঞেস করল, তাঁকে এখন এখানে পাব?

—পাওয়া তো উচিত।

বকু ম্যানেজারকে ধন্যবাদ দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

ম্যানেজার বললেন, রিভলবারটা দিয়ে যান।

বকু বলল, কিন্তু এটা যে আমার দরকার হবে।

ম্যানেজার বললেন, ভয় নেই। প্রশান্তবাবুর কাছেও রিভলবার আছে।

—উনি কি সেটা দেবেন?

—দেবেন না কেন? এই পৃথিবীতে কে না মরতে চায়।

বকু ম্যানেজারকে রিভলবার ফিরিয়ে দিল। ম্যানেজার সেটা পুনরায় ড্রয়ার খুলে ভিতরে রাখলেন।

বকু বলল, আজ তাহলে আসি।

—আসুন।

বকু ঘর থেকে বেরিয়ে এল। তারপর সিঁড়ি দিয়ে নেমে রাস্তায় এসে দাঁড়াল। মনে মনে ম্যানেজারকে অজস্র ধন্যবাদ দিল। লোকটা মোটেই খারাপ নয়। প্রথমে অবশ্য বেশ খারাপ বলে মনে হয়েছিল। শেষে দেখা

গেল লোকটা আসলে ভালো। তার সঙ্গে কত সুন্দর ব্যবহার করলেন। এখন মালিক অর্থাৎ প্রশান্ত ধর তার সঙ্গে কিরকম ব্যবহার করেন সেটাই দেখার।

বকু একসময় মালিক প্রশান্ত ধরের ঠিকানায় এসে উপস্থিত হল। এটাও বিশাল বাড়ি। বকু বাড়ির ভিতরে ঢুকে একজনকে জিজ্ঞেস করল, মিস্টার ধর কোথায় বসেন ?

লোকটা উত্তর দিল, চারতলায়।

বকু লিফটে করে চারতলায় উঠে এল। সেখানে আর একজনকে জিজ্ঞেস করল, মিস্টার ধর কোথায় বসেন ?

সে ঘর দেখিয়ে দিল। সে ঘরের সামনে যথারীতি একজন টুলে বসে আছে। বকু তাকে জিজ্ঞেস করল, মিস্টার ধর ভিতরে আছেন ?

—আছেন।

—আমি একটু দেখা করতে চাই।

—কোত্থেকে আসছেন ?

বকু ঠিকানা বলল। লোকটা তা শুনে বলল, কিন্তু এখন তো দেখা হবে না।

—কেন ?

—উনি এখন মিটিং-এ বসেছেন।

—মিটিং কখন শেষ হবে ?

—একটু পরেই।

—আমি তাহলে অপেক্ষা করব ?

—করুন।

ঘরের সামনেই ওয়েটিং রুম। বকু ওয়েটিং রুমে অপেক্ষা করতে লাগল। করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়ল। একবার ভাবল চলে যায়। অন্য একদিন এসে দেখা করবে। তারপর আবার ভাবল এসেছে যখন দেখা করেই যাওয়া ভালো। পরে তার মন বদলে যেতে পারে। আজ যে উৎসাহ আছে, সাহস আছে, কাল তা নাও থাকতে পারে। মনে হতে পারে যা হয়েছে, হয়েছে। আর এ নিয়ে মাথা গরম করে লাভ নেই। সুতরাং যা করবার আজই করতে হবে।

এই সব ভাবতে ভাবতে বকু প্রায় ঘুমিয়ে পড়েছিল। এমন সময় বেয়ারা

এসে তাকে ডাকল, যান এবার।

বকু ধড়মড়িয়ে উঠে পড়ল। বলল, মিটিং শেষ হয়েছে?

—অনেকক্ষণ।

বকু আর কথা বাড়াল না। সে মিস্টার ধরের দরজা খুলে ভিতরে ঢুকল। সাজানো গোছানো তকতকে ঘর। মিস্টার ধর বসেছিলেন। তাঁর হাতে একটা বই। মিস্টার ধর বকুর মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কি চাই?

বকু বেশ শান্ত গলায় বলল, আপনার সঙ্গে একটা কথা ছিল।

—কি কথা?

বক ঢোক গিলে বলল, বসতে পারি?

—বসুন।

বকু একটা গদি-আঁটা চেয়ারে বসল। বসেই জিজ্ঞেস করল, এবার বলি?

—বলুন।

—আমি জানতে চাই আমার বাবা আপনার কাছে কি অপরাধ করেছিল?

—কে আপনার বাবা?

বকু নাম বলল।

—তিনি কি আমার অফিসে চাকরি করেন?

—না।

—তাহলে আপনি...

—কিছুদিন হল আমার বাবা মারা গেছে।

—দুঃখিত। তা, কিসে মারা গেছেন?

—সর্দিজ্বরে।

—সর্দিজ্বরে!

—হ্যাঁ। অবশ্য মরে যাওয়াব কথা ছিল না। কিন্তু আপনার কোম্পানির ওষুধ খেয়েই মরে গেল।

—বাজে কথা।

—সত্যি কথা। কারণ ক্যাপসুলে ওষুধ ছিল না, পোকা ছিল, বিষাক্ত পোকা। এই দেখুন।

বকু ক্যাপসুল খুলে মিস্টার ধরকে দেখাল।

মিস্টার ধর দেখে বললেন, এটা পোকা নয়, ওষুধ। আর এটা

বিষাক্তও নয়।

—হ্যাঁ, এটা বিষাক্ত।

—কে বলেছে আপনাকে?

—দেবদূত।

—দেবদূত! সে আবার কে?

—দেবদূত, মানে ভগবানের দূত।

—ভগবান কে?

—ভগবানকে চিনতে পারছেন না?

—না।

বকু তখন বোঝাতে চেষ্টা করল ভগবান কে। বোঝাতে চেষ্টা করল, তিনি সাকার না নিরাকার। বোঝাতে চেষ্টা করল সাকারবাদীরা তাঁকে কিভাবে উপাসনা করে, নিরাকারবাদীরা তাঁকে কিভাবে উপাসনা করে। এই সঙ্গে বোঝাল উপাসনার ফলাফল। এবং সবার শেষে বলল আমাদের সকলের ভগবানকে বিশ্বাস করা উচিত। করলে স্বর্গলাভ হয়।

মিস্টার ধর সব মনোযোগ দিয়ে শুনে বললেন, খুব মজার তো।

বকু বলল, হ্যাঁ, খুব মজার। আপনি বিশ্বাস করুন। আপনারও স্বর্গলাভ হবে।

—ঠিক?

—ঠিক।

—তা, ভগবান সম্পর্কে এত কথা কোত্থেকে জানলেন?

—বাবার কাছ থেকে। বাবা বেঁচে থাকলে ভগবান সম্পর্কে আরো অনেক কথা জানতে পারতাম। আপনার কোম্পানির ওষুধ খেয়ে বাবা মরে গেল। আমার আর কিছু জানা হল না।

—আপনার বাবা কি স্বর্গে গেছেন?

—নিশ্চয়।

—স্বর্গ জায়গাটা কেমন?

—খুব ভাল। আপনি স্বর্গের বর্ণনা শুনবেন?

—আমার যে সময় নেই।

—এক মিনিট?

—এক মিনিটও সময় নেই।

—তাহলে আমারো সময় নেই। আপনি শিগ্‌গির আপনার রিভলবারটা দিন।

—রিভলবার দিয়ে কি হবে?

—আপনাকে খুন করব।

—কেন?

—আমার পিতার হত্যাকারীর প্রতিশোধ নেব।

কথাটা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মিস্টার ধর বেল বাজিয়ে বেয়ারাকে ডাকলেন। তারপর বকুকে লক্ষ্য করে বেয়ারাকে বললেন, একে বের করে দাও। বেয়ারা তারপর বকুকে প্রায় ধাক্কা মেরে ঘর থেকে বের করে দিল। বকু অত্যন্ত লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়ে অফিস থেকে বেরিয়ে এল। তার মন ভীষণ খারাপ হয়ে গেল। কি এখন করবে তা তার মাথায় এল না।

রাত্রিবেলা শুয়ে শুয়ে বকু দেবদূতের কথা ভাবতে লাগল। তাকে দেবদূত বলেছিল কোনও ভাবনা নেই। ভগবান তার পিছনে আছে। কিন্তু কোথায় ভগবান! ভগবান তার হয়ে কিছুই করল না। উলটে সে বিচ্ছিরিভাবে অপমানিত হল। এটা ভগবান না করলেই পারত। মনে মনে সে ভগবানের ওপর ক্ষুব্ধ হল। বারবার বলতে লাগল, ভগবান, তুমি একি করলে।

এবারেও ভগবান দেখা দিল না। তার বদলে দেবদূতকে পাঠিয়ে দিল। দেবদূতকে দেখেই বকু আরো রেগে গেল। জিজ্ঞেস করল, আবার কি করতে এসেছেন? আপনাকে তো আমি ডাকিনি।

—আপনি তো ভগবানকে ডাকছিলেন।

—তা আপনি কেন?

—ভগবান আমাকে পাঠালেন।

—আপনি চলে যান। আপনাকে আমার দরকার নেই।

—কিন্তু আমাদের দরকার আছে।

—কি দরকার?

—ভগবান আপনাকে হতাশ হতে বারণ করেছেন।

—কিন্তু আমার যে আর করার কিছু নেই।

—আছে, নিশ্চয় আছে।

—বলুন, কি করব?

—কাল থানায় যান।

—যদি কিছু না হয় ?

—স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করুন।

—তাতেও যদি কিছু না হয় ?

—মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করুন।

—তাতেও যদি কিছু না হয় ?

—খবরের কাগজে খবর দিন।

—খবর যদি না ছাপে ?

—প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি দিন।

—তাতেও যদি...

দেবদূত এবার বিরক্ত হয়ে বললেন, ওহ্ ! এক কথা বারবার বলছেন কেন ? ভগবান আপনাকে হতাশায় ভেঙে পড়তে বারণ করেছে। আপনাকে অপরাধীর বিরুদ্ধে আজীবন সংগ্রাম চালিয়ে যেতে বলেছেন। বলেছেন ধর্মের জয় হবেই।

—কিন্তু ভগবান কথাটা নিজে এসে বলে গেলে ভালো করত।

—ভগবান আসবেন কি করে ? কোটি কোটি মানুষের সমস্যায় তিনি জর্জরিত। তাঁর এক মুহূর্ত কারো সঙ্গে কথা বলার সময় নেই। যাকগে, যা ভালো বোঝেন করবেন। আমার যা বলার ছিল বলে গেলাম। এই বলে দেবদূত চলে গেলেন। বকু ভগবানের কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ল, সকালে ঘুম থেকে উঠে তার আবার ভগবানের কথা মনে পড়ল, দেবদূতের কথা মনে পড়ল। মনে পড়ল, ধর্মের জয় হবেই। সঙ্গে সঙ্গে তার শরীরে মনে যেন নতুন শক্তি সঞ্চারিত হল। ঠিক করল ভগবান তাকে যা করতে নির্দেশ দিয়েছে সে তাই করবে। সে অপরাধীর বিরুদ্ধে আজীবন সংগ্রাম চালিয়ে যাবে। সে ভগবানের পক্ষে। ভগবান তার সহায়। অতএব তার জয় হবেই।

বকু সাহস নিয়ে প্রথমেই থানায় গেল। খোদ কর্তার সঙ্গে দেখা করল। ক্যাপসুল খুলে দেখাল এবং সব কথা বলল। সব শুনে তিনি বকুর অভিযোগ একটা খাতায় টুকে রাখলেন। সেই সঙ্গে বকুর নাম ঠিকানাও লিখে রাখলেন। তারপর যা বললেন তা সংক্ষেপে এই :

মিস্টার ধর দেশের গর্ব। তাঁরই প্রচেষ্টায় দিকে দিকে কারখানা তৈরি হয়েছে, শিল্পের প্রসার ঘটেছে। তিনি হাজার হাজার লোকের অন্নসংস্থানের

ব্যবস্থা করেছেন। দুদিন আগে যারা খেতে পেত না, তাঁরই কৃপায় তারা আজ খেতে পাচ্ছে। বউ ছেলেমেয়ে নিয়ে সুখে শান্তিতে বসবাস করছে। তিনি মানুষের মুখে হাসি ফুটিয়েছেন। এর জন্যে সমগ্র দেশবাসী তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। অথচ বকুই একমাত্র নরাধম যার মধ্যে কোনও কৃতজ্ঞতা নেই। শুধু তাই নয়, এহেন মহান কর্মীর বিরুদ্ধে নিয়ে এসেছে অত্যন্ত মিথ্যে এক অভিযোগ। এই ভয়ংকর মিথ্যে অভিযোগের জন্যই বকুর শাস্তি হওয়া উচিত।

বকু একথা শুনে বুঝতে পারল পুলিশের কাছ থেকে কোনও সাহায্যই সে পাবে না। সে সেখান থেকে ফিরে এল। তবে হতাশ হল না। কারণ তাকে এখন সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। পিছিয়ে পড়লে চলবে না। কারণ একদিন ধর্মের জয় হবেই।

বকু স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করল। স্বাস্থ্যমন্ত্রী তাকে যা বললেন তা সংক্ষেপে এই :

মিস্টার ধর একজন মহান দেশপ্রেমিক। আজ তাঁরই অর্থসাহায্যে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে হাসপাতাল তৈরি হয়েছে। গরিব মানুষেরা আগে চিকিৎসার সুযোগ পেত না। এখন তারা তাঁর কৃপায় বিনি পয়সায় চিকিৎসার সুযোগ পাচ্ছে। তিনি গ্রামেগঞ্জে অকালমৃত্যুর হার কমিয়ে এনেছেন। রুগ্‌ণ দুর্বল দেশবাসীর মধ্যে তিনি এনে দিয়েছেন যৌবন। এই সঙ্গে তিনি দেশবাসীর মানসিক উন্নতির জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। তিনি ঘরে ঘরে পৌঁছে দিচ্ছেন শিক্ষার আলো। তিনি দিকে দিকে তৈরি করছেন অজস্র স্কুল ও কলেজ। তাঁর শ্লোগান আজ প্রতিটি দেশবাসীর শ্লোগান : স্বাস্থ্য চাই, শিক্ষা চাই, বাঁচার মতো বাঁচতে চাই। অথচ এহেন যুগনায়ককে বকু তার পিতার হত্যাকারী হিসেবে শাস্তি দিতে চাইছে। বকুর এর জন্যে কঠোর শাস্তি হওয়া উচিত।

বকু বুঝল স্বাস্থ্যমন্ত্রী মিস্টার ধরের পক্ষে। তিনি তার জন্যে কিছুই করবেন না। তবে বকু হতাশ হল না। সে ভগবানের নাম নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করল। মুখ্যমন্ত্রী তাকে যা বললেন, তা সংক্ষেপে এই :

মিস্টার ধর একজন মহান যুগনায়ক। তিনি দেশকে অন্ধকার থেকে আলোয় নিয়ে এসেছেন। বর্তমানে আমরা যে যুগে বাস করি তা তাঁরই সৃষ্টি। তিনি দেশের মধ্যে সামন্ততান্ত্রিক চেতনার বিনাশ ঘটিয়ে এনেছেন গণতান্ত্রিক চেতনা। তিনিই ব্যক্তিস্বাধীনতার অলৌকিক মাহাত্ম্য এই দরিদ্র

নিরক্ষর দেশবাসীর মধ্যে প্রচার করেছেন এবং প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ফলে এখানে আজ একদিকে যেমন আছে বড়লোকের ধন উপার্জনের স্বাধীনতা, তেমনি আর একদিকে আছে ভিখিরির ভিক্ষে করার স্বাধীনতা। একদিকে যেমন আছে পোলাও খেয়ে বেঁচে থাকার স্বাধীনতা, তেমনি আর একদিকে আছে না খেয়ে মরে যাওয়ার স্বাধীনতা। তাই এখানে একজন স্বাধীনভাবে চাকরি করতে পারে, আবার একজন স্বাধীনভাবে বেকার হয়ে থাকতে পারে। এখানে একদিকে যেমন সৃষ্টি করা হয়েছে লেখাপড়া শেখার অবাধ সুযোগ, আবার তেমনি পাশাপাশি সৃষ্টি হয়েছে নিরক্ষর থাকার উপযুক্ত পরিবেশ। এখানে একজন ইচ্ছে করলে ভগবানে বিশ্বাস করতে পারে, আবার ইচ্ছে করলে নাও করতে পারে। কিছুই যায় আসে না। সকলেই এর জন্যে তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। তিনি তাঁদের দলের সভাপতি। তিনি তাঁদের লক্ষ লক্ষ টাকা দেন। এহেন মহাপুরুষের বিরুদ্ধে বকু এমন এক ভয়ংকর অভিযোগ এনেছে যা কানে শোনাও পাপ। বকুর এই মুহূর্তে ফাঁসি অথবা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হওয়া উচিত।

বকু বুঝল এখানেও কোন সুবিধে হবে না। তবু বকু হাল ছেড়ে দিল না। সংবাদপত্রের অফিসে অফিসে ঘুরল। ক্যাপসুল দেখাল। সব কথা খুলে বলল। কিন্তু কেউ মিস্টার ধরের বিরুদ্ধে কোনও খবর ছাপতে রাজি হল না। একজন সাংবাদিক বকুকে গোপনে বললেন, দেখুন, আমরা মিস্টার ধরের কাছ থেকে লক্ষ লক্ষ টাকার বিজ্ঞাপন পাই, তিনি বিজ্ঞাপন দেওয়া বন্ধ করলে কাগজ উঠে যাবে। অতএব মিস্টার ধরের বিরুদ্ধে কোনও খবর ছাপা যাবে না। আর স্বাধীন দেশে কোনও খবর ছাপার বা না ছাপার স্বাধীনতা কাগজের আছে।

এরপর বকু প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশে একটা চিঠি দিল, যদি কাজ হয় তাহলে এতেই হবে। চিঠিটা এই :

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী,

আমি একজন সাধারণ মানুষ। আমার পিতাও একজন সাধারণ মানুষ ছিলেন। আমার জীবনে তিনিই ছিলেন সব। কিন্তু তিনি বিখ্যাত শিল্পপতি শ্রীপ্রশান্ত ধরের কোম্পানি নির্মিত ক্যাপসুল খাইয়া অকালে পরলোক

গমন করিয়াছেন। কারণ তাঁর কোম্পানির তৈরি ক্যাপসুলে ওষুধ ছিল না, ছিল বিষাক্ত পোকা। আপনি আমাদের মহান নেতা। আমি আপনার কাছে ইহার তদন্ত প্রার্থনা করিতেছি। কারণ আপনি ছাড়া আর কে ইহার প্রতিবিধান করিবে? অপরাধীকে যোগ্য শাস্তি দিয়া আমার শোকার্ত হৃদয় শান্ত করুন।

অধিক কি? আপনি আমার শ্রদ্ধা গ্রহণ করুন। ইতি—

বকু চট্টোপাধ্যায়

এই চিঠিট ডাকবাক্সে ফেলে বকু অনেকদিন অপেক্ষা করল। প্রতিদিন ঘুম থেকে উঠে ভাবতে লাগল, আজ তার চিঠির উত্তর আসবে, কিন্তু কোনো উত্তর এল না। শেষে চিঠির বদলে বকুর কাছে পুলিশ অফিসার এসে হাজির হলেন। পুলিশ অফিসার তাকে বললেন, আপনাকে গ্রেপ্তার করা হল।

বকু বলল, আপনি ভুল করছেন, আমি কাফকার যোসেফ কে নই। আমি পশ্চিমবঙ্গের বকু চট্টোপাধ্যায়।

পুলিশ অফিসার বকুর কথা গ্রাহ্য করলেন না। তাকে ধরে নিয়ে গেলেন। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ সে মহামানব শ্রী প্রশান্ত ধরের বিরুদ্ধে ঘৃণ্য চক্রান্তে লিপ্ত।

আদালতে বকুর বিচার হল। সাজা হল তিন বছর জেল। জেলে ঢুকে বকু ভগবানের উদ্দেশে বলল, ভগবান! শেষ পর্যন্ত তুমি আমায় জেলে পাঠালে!

সঙ্গে সঙ্গে জেলের মধ্যে দেবদূত হাজির হলেন। বললেন, চিন্তা করবেন না, ধর্মের জয় হবেই।

—আর কবে হবে?

—জেল থেকে বেরলেই হবে।

বকু উৎফুল্ল হয়ে উঠল। জিজ্ঞেস করল, সত্যি?

দেবদূত আশ্বাস দিয়ে বললেন, সত্যি।

কিন্তু জেল থেকে বেরিয়ে বকু কোনও পরিবর্তন দেখতে পেল না। শ্রীপ্রশান্ত ধর যেমন ছিলেন, তেমনি আছেন। বরঞ্চ তাঁর প্রভাব আরো বেড়েছে। আগে ঘরে ঘরে তাঁর ছবি টাঙানো হত না, এখন হচ্ছে। দুঃখে হতাশায় বকু ভেঙে পড়ল। বুঝতে পারল ভগবান তাকে মিথ্যে আশ্বাস দিয়েছে। ধর্মের জয় কোনদিন হবে না। হলেও সে তার জীবনে তা দেখে

যেতে পারবে না। বকুর আর বেঁচে থাকার ইচ্ছে রইল না। সে একদিন খুব করে বৃষ্টিতে ভিজল। তারপর সর্দিজ্বরে পড়ল এবং ডাক্তার দেখাল। ডাক্তারবাবু তাকে ক্যাপসুল খেতে বললেন। সে ক্যাপসুল নিয়ে এল। খাবার আগে ক্যাপসুলটা খুলল, দেখল, ক্যাপসুলের ভিতরে যথারীতি কোনও ওষুধ ভরা নেই। সেই একই বিষাক্ত পোকা ভরা আছে। সে পরম নিশ্চিন্তে একটার পর একটা ক্যাপসুল খেয়ে চলল।

তিনদিন পর বকু টের পেলো তার মৃত্যু ঘনিয়ে আসছে। সে ভগবানের উদ্দেশে বলল, ভগবান! চললাম। আমার সব চেষ্টাই ব্যর্থ হল। তুমি আমার জন্যে কিছুই করলে না। অথচ তোমাকে কত বিশ্বাস করেছিলাম।

সঙ্গে সঙ্গে দেবদূত দেখা দিয়ে বললেন, দুঃখ করবেন না। আপনি ধর্মের জন্যে লড়াই করেছেন। স্বর্গলাভ আপনার হবেই।

বকুর তখন কথা বলার ক্ষমতা ছিল না। উত্তরে সে শুধু একটু হাসল।

ফু

মুখ্যমন্ত্রী আমার জ্যাঠামশাই। কিন্তু তাঁকে ধরে আমি এই সরকারী চাকরি পাইনি, পরীক্ষা দিয়েই পেয়েছি। জ্যাঠামশাই অবশ্য অন্য কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, আমি নাকি তাঁকে ধরেই চাকরিটা পেয়েছি। কথাটা শুনতে আমার খারাপ লেগেছে। তবে তাঁকে সরাসরি কিছু বলিনি। কারণ তিনি জ্যাঠামশাই হলেও মুখ্যমন্ত্রী। তিনি শুধু জ্যাঠামশাই হলে তাঁকে দুটো কড়া কথা শুনিয়ে দিতাম। কিন্তু তিনি মুখ্যমন্ত্রী বলেই কিছু বলতে পারিনি, চুপ করে থেকেছি। সরকারী চাকরি করে কে আর মুখ্যমন্ত্রীকে চটাতে চায়! আমিও চাই না। তবু একদিন কথায় কথায় একজনকে হঠাৎ বলে ফেললাম, জ্যাঠামশাই বড় মিথ্যেবাদী। কথাটা জ্যাঠামশাইয়ের কানে উঠতে দেরি হল না। তিনি তখন আমাকে কলকাতা থেকে কুচবিহারে বদলি করে দিলেন। তারপর থেকে কলকাতার মুখ বড় একটা দেখিনি। কুচবিহার থেকে বদলি হয়ে গেছি মেদিনীপুর, মেদিনীপুর থেকে বদলি হয়ে গেছি জলপাইগুড়ি। এইভাবে আমাকে ষোল বছর ঘুরিয়ে জ্যাঠামশাইয়ের দয়া হল। তিনি আমাকে কলকাতায় নিয়ে এলেন। আমি একটা ফ্ল্যাট ভাড়া করে মনের আনন্দে চাকরি করতে লাগলাম, বউকে নিয়ে সিনেমা দেখতে লাগলাম, আত্মীয়স্বজনদের বাড়ি যেতে লাগলাম। আমি বউকে মিনু বলে ডাকি।

একদিন সকালে বিছানায় বসে সবে চা-এ চুমুক দিয়েছি, এমন সময় মিনু ঘরে ঢুকে বলল, একটা দুর্গন্ধ পাচ্ছ?

বললাম, দুর্গন্ধ। কই, না তো!

—সে কি। আমি তো পাচ্ছি।

—এখনো পাচ্ছ?

—হ্যাঁ।

আমি তখন চা খাওয়া থামিয়ে গন্ধটা পাওয়ার চেষ্টা করলাম। করতেই গন্ধটা নাকে এল। বিচ্ছিরি গন্ধ।

বললাম, এবার পাচ্ছি। গন্ধটা বোধহয় এই জানালা দিয়ে আসছে।

জানালাটা বন্ধ করে দাও।

মিনু জানালাটা বন্ধ করে দিল। এতে গন্ধটা কমল, কিন্তু দূর হল না।

জিজ্ঞেস করলাম, কিসের গন্ধ ?

মিনু বলল, বুঝতে পারছি না।

—পেচ্ছাপের ?

—হতে পারে।

—আবর্জনার ?

—হতে পারে।

—জানালাটা খুলে দেখ তো।

মিনু জানালাটা খুলে মুখটা বাড়িয়ে আবার ভিতরে ঢুকিয়ে নিল। বলল, একবার দেখে যাও।

—কি দেখব ?

—আহ্‌! দেখে যাও না।

আমি চায়ের কাপ ফেলে উঠে পড়লাম। জানালা দিয়ে মুখ বাড়াতেই চোখে পড়ল আবর্জনার স্তূপ; তার পাশে একটা মরা কুকুর। আমি তাড়াতাড়ি জানালাটা বন্ধ করে আবার জায়গায় এসে বসলাম।

মিনু বলল, কি হবে এখন ? আমি সারাদিন এই দুর্গন্ধের মধ্যে কি করে থাকব ?

—অত ভাবছ কেন ? একটু পরেই করপোরেশন থেকে লোক আসবে, সব তুলে নিয়ে চলে যাবে।

—যদি না নিয়ে যায় ?

—কর্পোরেশনকে ফোন করব।

—কে করবে ? তুমি তো একটু পরেই অফিসে চলে যাবে।

—আমি অফিসে গিয়েই ফোন করব।

—ভুলে যাবে না তো ?

—ভুলব কেন।

মিনু এইসময় নাকে কাপড় চেপে বলল, উহ্‌! কি বিচ্ছিরি গন্ধ। বমি ঠেলে আসছে। তুমি এক্ষুনি কিছু একটা কর।

—কি করব ?

—বাড়িওয়ালাকে বল।

—বাড়িওয়ালা কি করবে!

—সামনের ফ্ল্যাটের মিস্টার সেনকে বল।

—উনিই বা কি করবেন?

—তাহলে অন্যান্য ভাড়াটেদের বল।

মিনুর অনুরোধ উপেক্ষা করা গেল না। সামনের ফ্ল্যাটের মিস্টার সেনকে ডেকে বললাম, একটা দুর্গন্ধ পাচ্ছেন?

—পাচ্ছি।

—কেন জানেন?

—জানি। কয়েকদিন ধরে আবর্জনা সরানো হয়নি।

—একটা মরা কুকুরও পড়ে আছে।

—তাও দেখেছি।

—একটা কিছু করা যায় না?

—কি করবেন?

—কর্পোরেশনকে বলে···

—বলে লাভ নেই। আমি গতকাল দুবার ফোন করেছি। কিছু হয়নি। এখন আপনি একবার চেষ্টা করে দেখতে পারেন।

আমি এবার বাড়িওয়ালার কাছে গেলাম। শুনলাম, তিনিও দুবার কর্পোরেশনকে ফোন করেছিলেন। কোন কাজ হয়নি। আমি বললাম, আমাদের তাহলে দুর্গন্ধ সহ্য করতে হবে?

বাড়িওয়ালা বললেন, তাছাড়া উপায় কি বলুন!

এরপর ইচ্ছে করলে মিস্টার দত্ত বা মিস্টার মিত্র-র কাছে যেতে পারতাম, কিন্তু বুঝলাম গিয়ে লাভ হবে না। কারণ তাঁরাও হয়ত ঐ একই কথা বলবেন। আমি তাই হতাশ হয়ে ফিরে এলাম। মিনু সব শুনে বলল, এদের কথা শুনে তুমি চুপ করে থেকো না। অফিসে গিয়ে কর্পোরেশনে একবার ফোন কর। দেখ, কি বলে! আর মুখ্যমন্ত্রী যে তোমার জ্যাঠামশাই সে কথা বলতে ভুলো না।

এটা ভোলার ব্যাপার নয়। আমি তাই অফিসে গিয়ে সরাসরি মেয়রকেই ফোন করলাম। বললাম, কি ব্যাপার বলুন তো? কদিন ধরে আমাদের পাড়ায় আবর্জনা জমছে তো জমছেই, সরানোর লোক আসছে না। আজ আবার দেখি একটা মরা কুকুর পড়ে আছে। আপনাদের বারবার বলা সত্ত্বেও

গা করছেন না ! একটা ব্যবস্থা করুন । আমরা যে আর দুর্গন্ধে টিকতে পারছি না ।

—আপনাদের কত নম্বর ওয়ার্ড ?

বললাম ।

—রাস্তার নাম ?

বললাম ।

—আচ্ছা দেখছি, কি করা যায় ।

আমি একথায় চটে গেলাম । বললাম, দেখছি ফেখছি নয়, যা করার এখুনি করুন । মনে রাখবেন মুখ্যমন্ত্রী আমার জ্যাঠামশাই ।

—সত্যি ?

—হ্যাঁ ।

—তাহলে এখুনি গাড়ি পাঠিয়ে দিচ্ছি ।

আমি নিশ্চিন্ত হলাম । আর জ্যাঠামশাই আমার মুখ্যমন্ত্রী বলে মনে মনে একটু গর্বও হল । ভাবলাম জ্যাঠামশাই মিথ্যেবাদী হতে পারে, কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী তো ! মুখ্যমন্ত্রী বলেই আমি মেয়রকে ধমকাতে পারলাম । অবশ্য জ্যাঠামশাই এই ঘটনার কথা জানতে পারলে রেগে যেতে পারেন । কারণ তাঁকে না জানিয়ে তাঁর নাম ভাঙিয়ে কাজ উদ্ধারের চেষ্টা করেছি । তবে আমি কোন অন্যায় করিনি । আমি তো আমার ব্যক্তিগত কাজে তাঁর নাম ভাঙাইনি । এতে অনেকের স্বার্থ জড়িয়ে আছে । জ্যাঠামশাইয়ের মোটেই রাগ করা উচিত নয় । আর রাগ করলেই বা কি যায় আসে ! আবার বদলি করে দেবে ! দেয়, দেবে । অত ভয় পাওয়ার কিছু নেই ।

যাইহোক, খুশি মনে সন্ধেবেলা বাড়ি ফিরলাম । ফ্ল্যাটের ডোর-বেল টিপে মিনুর হাসিমুখের অপেক্ষা করতে লাগলাম । কিন্তু মিনুর মুখে হাসি নেই । দরজা খুলতেই তার সারা মুখে আতঙ্ক চোখে পড়ল ।

মিনু আমাকে জিজ্ঞেস করল, তুমি কর্পোরেশনে ফোন করনি ?

অবাক হয়ে বললাম, হ্যাঁ, করেছিলাম ।

—তোমার জ্যাঠামশাইয়ের নাম করেছিলে ? বলেছিলে, মুখ্যমন্ত্রী আমার জ্যাঠামশাই ?

—নিশ্চয় ।

—তাহলে ?

—কেন ? কি হয়েছে ?

—কি হয়েছে। এসো, দেখে যাও।

আমি শোবার ঘরে ঢুকলাম। মিনু বন্ধ জানালা খুলে দিল। আমার নাকে ভক করে দুর্গন্ধ এল। আমি নাক বন্ধ করে মুখ বাড়িয়ে দিলাম। দেখি, কুকুরটা যেখানে পড়ে ছিল, সেখানেই পড়ে আছে। উপরন্তু পাশে একটা মানুষের মৃতদেহ। নিশ্চয় কেউ খুন করে ফেলে গেছে। আমি তাড়াতাড়ি জানালা বন্ধ করে দিলাম। হতভম্ব হয়ে বললাম, কিছু বুঝতে পারছি না। মিনু জিজ্ঞেস করল, তুমি কাকে ফোন করেছিলে ?

—কেন। খোদ মেয়রকে।

—তিনি কি বললেন ?

—তিনি বললেন আমি এখুনি লোক পাঠিয়ে দিচ্ছি।

—আশ্চর্য।

—তুমি শিগগির পুলিশে ফোন কর।

—মিস্টার সেন নতুন এই ঘটনার কথা জানেন ?

—জানি না।

—বাড়িওয়ালা ?

—জানি না।

—আমি আবার ওদের সঙ্গে দেখা করব ?

—কর।

আমি আবার মিস্টার সেনের সঙ্গে দেখা করলাম। শুনলাম, তিনি থানায় ফোন করেছিলেন, কোন ফল হয়নি। বাড়িওয়ালাও ঐ একই কথা বললেন। তখন বললাম, আমি একবার ফোন করব ?

—কোথায় ?

—থানায়।

—করুন।

আমি লোকাল থানার ও সি-কে ফোন করলাম। আমার কপাল গুণে থানার ও সি তাঁর ঘরেই ছিলেন। তিনি ফোন ধরলেন।

—হ্যালো···

আমি তখন তাঁকে আমার নাম বললাম। কোত্থেকে বলছি, বললাম। বলার পরে বললাম, আমাদের ফ্ল্যাট-বাড়ির পিছন দিকে একটা মড়া পড়ে

আছে। মনে হয় কেউ খুন করে ফেলে গেছে।

—তাই নাকি!

—হ্যাঁ।

—কে খুন করেছে? আসামীর নাম বলতে পারবেন?

—খুনীর নাম জানলে বলতাম। কিন্তু আমি আপনাকে আসামী ধরার জন্যে ফোন করছি না।

—তাহলে কিসের জন্যে ফোন করছেন?

—আপনি এটা সরানোর ব্যবস্থা করুন। আমরা দুর্গন্ধে টিকতে পারছি না।

—কিন্তু আমাদের হাতে এখন অনেক কাজ। আমাদের এখন মড়া সরানোর সময় নেই।

—আমরা তাহলে দুর্গন্ধ ভোগ করব?

—করুন কিছুদিন। সবই যখন সহ্য করছেন, এটাও করুন।

—কি বলছেন আপনি? জানেন মুখ্যমন্ত্রী আমার জ্যাঠামশাই!

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ।

—তা এটা প্রথমে বললেই হত। যাকগে, আমি এখুনি গাড়ি পাঠিয়ে দিচ্ছি। চিন্তার কিছু নেই।

আমি ফোন ছেড়ে দিলাম। বাড়িওয়ালা অবাক হয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, মুখ্যমন্ত্রী আপনার জ্যাঠামশাই?

—হ্যাঁ।

—তা, এটা এতদিন চেপে ছিলেন?

খুব বিনয়ের সঙ্গে বললাম, এটা আগ বাড়িয়ে বলার কি আছে?

—নেই! কি বলছেন! যাকগে, আমার একটা উপকার করুন।

—কি?

—আমার ছেলের একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দিন।

এই মুহূর্তে এই অনুরোধ শুনে আমার রাগ হল। ইচ্ছে হল বলি, আমি আমার চাকরির জন্যে জ্যাঠামশাইকে ধরিনি। আপনার ছেলের চাকরির জন্যেও জ্যাঠামশাইকে ধরতে পারব না। কিন্তু সেকথা তাঁকে না বলে বললাম, এখন আমরা যে সমস্যায় পড়েছি আগে সেটা থেকে উদ্ধার পাই,

তারপর ওসব কথা ভাবা যাবে।

বাড়িওয়ালা বললেন, দূর! এটা নিয়ে এত ভাবার কি আছে? এরকম ঘটনা তো প্রায়ই হয়। আমাদেয় এসব সহ্য হয়ে গেছে।

আমার এখনো হয়নি।—বলে আর কথা না বাড়িয়ে চলে এলাম।

মিনু আমার জন্যে অপেক্ষা করছিল। আমি তাকে ওসি-র সঙ্গে যা যা কথা হয়েছে সব বললাম। মিনু সব শুনে বলল, এখন ও সি যদি কিছু না করে?

—তাহলে এবার জ্যাঠামশাইকে ফোন করব।

সেটাই শেষ পর্যন্ত করতে হবে।—বলে মিনু চা করতে রান্নাঘরে ঢুকল।

আর আমি বসার ঘরে ঢুকে টিভি খুলে দিলাম। কিন্তু টিভিতে মন দিতে পারলাম না। বন্ধ করে দিলাম।

একটু পরে মিনু চা নিয়ে এল। আমার হাতে চায়ের কাপ তুলে দিয়ে বলল, আমার ধারণা ও সি কিছু করবে না।

আমি চা-এ চুমুক দিয়ে বললাম, অত ব্যস্ত হয়ো না। ধৈর্য ধরে একটু অপেক্ষা কর।

এ কথায় মিনু অসহিষ্ণু হয়ে উঠল। বলল, আমি আর অপেক্ষা করতে পারছি না। তুমি সারাদিন বাড়ি থাক না, এই দুর্গন্ধও ভোগ কর না। তাই সহজেই বলতে পার, অপেক্ষা কর।

—এছাড়া এখন আর কি করব?

মিনু এইসময় বলে উঠল, এই দেখ, এখন এ ঘরেও গন্ধ আসছে।

—গন্ধ!

—হ্যাঁ, পাচ্ছ না!

তাড়াতাড়ি চা খাওয়া শেষ করে গন্ধটা পাওয়ার চেষ্টা করলাম। হ্যাঁ, গন্ধ আসছে। সেই এক পচা গন্ধ। আমি নাক চেপে বললাম, কি ব্যাপার! গন্ধটা কোনদিক দিয়ে আসছে? সব জানালাই তো বন্ধ। তাহলে? দেখতো ফ্ল্যাটের দরজা বোধহয় লাগানো হয়নি।

মিনু সঙ্গে সঙ্গে উঠে গেল। ফ্ল্যাটের দরজা খোলাই ছিল। বন্ধ করে আবার ফিরে এল। তবু গন্ধ গেল না।

মিনু বলল, কি জায়গায় যে ফ্ল্যাট নিয়েছে!

—আমার কি দোষ! সবাই বলল এটা খুব ভাল জায়গা। কিন্তু এটা যে···

—আর এখানে থাকা যাচ্ছে না। আমার মাথা ধরে গেল।

—চল তাহলে, বাইরে একটু ঘুরে আসি।

—তাই চল।

দুর্গন্ধের হাত থেকে বাঁচার জন্যে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। কিন্তু কোথায় যাওয়া যায়? সোজা হাঁটতে লাগলাম। থেকে থেকে পেচ্ছাপের গন্ধ নাকে এল, আবর্জনার গন্ধ নাকে এল, মরা কুকুর-বেড়ালের গন্ধ নাকে এল। এইসব গন্ধের মধ্যে নাক চেপে হাঁটতে হাঁটতে একটা পার্ক পেয়ে গেলাম। আমরা পার্কে ঢুকে একটা খালি বেঞ্চ দেখে বসলাম। পার্কে হাওয়া ছিল। হাওয়ায় পচা গন্ধ ছিল।

মিনু বলল, এখানেও গন্ধ!

বললাম, তাইতো দেখছি।

—চলো, অন্য কোথাও যাই।

—কোথায় যাবে? সারা শহর জুড়েই হয়তো একই গন্ধ।

—আমি এখানে থাকব না।

—অত ব্যস্ত হয়ো না। নিশ্চয় এর একটা উপায় হবে। রাত নটার সময় আমরা উঠে পড়লাম। পার্ক ছেড়ে বেরিয়ে এলাম। আর তখনি সারা শরীর শিউরে উঠল। দেখি, রাস্তার ধারে একটা মানুষ পড়ে আছে। তার মাথা থ্যাঁতলানো। মিনু সেদিকে তাকিয়ে বলে উঠল, উহ্‌! তাকানো যায় না। শিগগির এখান থেকে চলো। আমি তাড়াতাড়ি সে জায়গা পেরিয়ে যেতে যেতে বললাম, কি বীভৎসভাবে লোকটাকে খুন করেছে!

মিনু বলল, আমরা গ্রামেই ভালো ছিলাম।

আমি একথার উত্তর দিলাম না। চারদিকের দুর্গন্ধের মধ্য দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বাড়ি ফিরে এলাম। ফ্ল্যাটে ঢুকেই প্রথমে শোবার ঘরে গেলাম। জানালা খুলে দিলাম। মুখ বাড়িয়ে বুঝতে পারলাম পুলিশ আসেনি। মৃতদেহ যেখানে ছিল, সেখানেই আছে। শুধু তাই নয়, পাশে আর একটা মৃতদেহ। একেও খুন করে কারা ফেলে দিয়ে গেছে। আমি তাড়াতাড়ি জানালা বন্ধ করে দিলাম।

মিনু জিজ্ঞেস করল, কি দেখলে?

বললাম, তুমি ঠিকই বলেছিলে।

—পুলিশ আসেনি?

—না।

—তাহলে কি হবে ?

—কাল জ্যাঠামশাইকে ফোন করব।

—এখন থানায় আর একবার ফোন কর না।

—লাভ নেই। কেউ আসবে না।

আমরা সারারাত ভালো করে ঘুমোতে পারলাম না। শেষ রাতের দিকে একটু ঘুম এসেছিল। কিন্তু বেশিক্ষণ ঘুমোতে পারলাম না। সকালে ডোর-বেলের শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। কোনরকমে বিছানা ছেড়ে উঠে দরজা খুলে দিলাম। দেখি মিস্টার সেন দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি আমাকে দেখেই জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি এই ঘুম থেকে উঠলেন ?

—হ্যাঁ।

—আপনার সঙ্গে কথা আছে। আপনি তাড়াতাড়ি আমার ঘরে আসুন। আপনার জন্যে অনেকে অপেক্ষা করছেন।

—মিটিং ?

—হ্যাঁ।

—আপনি যান। আমি এখুনি যাচ্ছি।

মিস্টার সেন চলে গেলেন। আমি তাড়াতাড়ি হাতমুখ ধুয়ে চা খেয়ে মিস্টার সেনের কাছে গেলাম। গিয়ে দেখি সেখানে অনেকেই এসে হাজির হয়েছেন। বাড়িওয়ালা ছাড়াও এই ফ্ল্যাটবাড়ির অন্যান্য ভাড়াটেরাও এসেছেন। মিস্টার দত্ত এসেছেন, মিস্টার বসু এসেছেন, মিস্টার মুখার্জি এসেছেন।

আমাকে প্রায় সবাই একসঙ্গে বলে উঠলেন, আসুন, আসুন।

আমি একটা চেয়ার টেনে বসলাম।

মিস্টার সেন বললেন, আপনি না থানায় ফোন করেছিলেন ?

বললাম, হ্যাঁ।

—কিন্তু থানা থেকে কেউ তো এল না।

—তাইতো দেখছি।

—আবার নতুন একটা মৃতদেহ দেখছি। আপনি দেখেছেন ?

—দেখেছি। কি করা যায় বলুন তো ?

—শুনলাম মুখ্যমন্ত্রী আপনার জ্যাঠামশাই। আপনি আমাদের হয়ে

এখন একবার মুখ্যমন্ত্রীকে ফোন করুন না।

—করছি। কিন্তু কি বলব?

—বলবেন এখুনি একটা কিছু ব্যবস্থা করতে। নইলে আমরা কেউ আর বাঁচব না। দুর্গন্ধে মারা যাব।

বাড়িওয়ালা চিন্তিত মুখে বললেন, আমার বউ তো কাল থেকে বমি করছে, একদম দুর্গন্ধ সহ্য করতে পারছে না।

মিস্টার সেন বললেন, আমার বউয়েরও ঐ এক অবস্থা।

মিস্টার দত্ত বললেন, আমার বউ তো গন্ধ সহ্য করতে না পেরে বাপের-বাড়ি চলে গেছে।

মিস্টার বসু বললেন, আমরা তো কাল সারারাত ঘুমোতে পারিনি।

এই সময় মিস্টার মুখার্জি হঠাৎ নাকে রুমাল চাপা দিয়ে বললেন, আবার গন্ধটা আসছে। আপনারা পাচ্ছেন?

মিস্টার সেন বললেন, পাচ্ছি।

তারপর সকলেই প্রায় একসঙ্গে বললেন, আমরাও পাচ্ছি।

তখন মিস্টার সেন আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। আপনি এখুনি আপনার জ্যাঠামশাইকে ফোন করুন। তাঁকে সব কথা বলুন।

ঘরের কোনে ফোন রাখা আছে। আমি সেখানে উঠে গেলাম। জ্যাঠা-মশাইয়ের বাড়িতে ফোন করলাম। জ্যাঠামশাই বাড়িতে ছিলেন। তিনিই ফোন ধরলেন।

—হ্যালো ··

—হ্যালো···জ্যাঠামশাই?

—কে?

—আমি বুলু কথা বলছি।

—বল, কি খবর? কেমন আছ?

—ভালো না।

—কেন?

—আমরা যে আর বাস করতে পারছি না।

—কি হয়েছে?

—আমাদের পাড়ায় কদিন ধরে আবর্জনা পরিষ্কারের লোক আসছে না।

আবার আবর্জনার পাশে কারা মরা কুকুর, বেড়াল, মানুষ ফেলে দিয়ে গেছে। আমরা দুর্গন্ধে টিকতে পারছি না।

—কর্পোরেশনে খবর দাও, থানায় খবর দাও।

—দিয়েছি।

—কেউ আসেনি ?

—না।

—মহা সমস্যায় ফেললে।

—জ্যাঠামশাই, প্লিজ···

—তুমি বুঝতে পারছ না, আমি এখন ভীষণ ব্যস্ত। সামনের অধিবেশনে বাজেট পেশ করতে হবে। আমার এখন এসব ব্যাপার নিয়ে···

—জ্যাঠামশাই, আপনার পায় পড়ি, আপনি···

—ঠিক আছে, আমি দেখছি কি করা যায়। তা, তোমার চাকরি কেমন চলছে ?

—ভাল।

—এস একদিন।

—আসব।

জ্যাঠামশাই ফোন ছেড়ে দিলেন। আমিও রিসিভার নামিয়ে রেখে জায়গায় ফিরে এলাম। ফিরে এসে জ্যাঠামশাই আমাকে যা বলেছেন তা সকলকে শুনিয়ে দিলাম। সকলে আমাকে ধন্যবাদ দিল। আমি তখন মিস্টার সেনের ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলাম। আসার সময় মিস্টার সেন আমাকে চুপিচুপি বললেন, আপনার সঙ্গে আমার একটা কথা ছিল।

—কি কথা ?

—বিদ্যুৎ দপ্তরে কিছু ছেলে নেবে। আপনার জ্যাঠামশাইয়ের হাতে এখন বিদ্যুৎ দপ্তর। আপনি আমার ছোট শালাকে এখানে ঢুকিয়ে দিন না। বড় উপকার হয়।

এই সংকটের মধ্যে এরকম আবদার শুনে আমার বাড়িওয়ালার কথা মনে পড়ল। বাড়িওয়ালাও তাঁর ছেলের জন্যে আমাকে বলেছেন। তাঁকে আমি না করিনি। এঁকেও না করলাম না। বললাম, দেখব।

মিস্টার সেন এই উত্তরে কৃতার্থ হয়ে চলে গেলেন। তারপর আমি যখন আমার ফ্ল্যাটের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছি তখন মিস্টার দত্ত এলেন। বললেন,

আপনাকে একটা অনুরোধ করব?

—কি?

—মুখ্যমন্ত্রী আপনার জ্যাঠামশাই। আপনি তাঁকে বলে আমার ভাইপোর একটা চাকরির ব্যবস্থা যদি করে দেন তাহলে বড় উপকার হয়।

আমি মুখে কোন বিরক্তি না প্রকাশ করে বললাম, দেখব।

যাইহোক, মুখ্যমন্ত্রী আমার জ্যাঠামশাই। জ্যাঠামশাই বলেই সকলে আমাকে চাকরির জন্যে ধরছে। এটা কম কথা নয়। মনে মনে আমার একটু গর্ব হল। আমি এই গর্ব নিয়ে স্নান করলাম, ভাত খেলাম, জামা ও জুতো পরলাম।

মিনু বলল, তুমি সাবধানে থেকে।

—কেন?

—খুব মানুষ খুন হচ্ছে।

—তাতে আমার কি?

—আমার ভয় করছে, যা দিনকাল পড়েছে।

—আমার কোন ভয় নেই। মুখ্যমন্ত্রী আমার জ্যাঠামশাই।

মিনু একথায় বোধহয় সান্ত্বনা পেল। তাই আর কিছু বলল না। আমিও বেরিয়ে পড়লাম।

কিন্তু অফিসে ঢুকেই মনটা ঘিনিয়ে গেল। এখানেও আজ দুর্গন্ধ। পেচ্ছাপখানায় নাকে রুমাল চেপে ঢুকতে হল। বারান্দায় দেওয়াল ঘেঁষে থুথু ফেলার পাত্র। সেখানে থুতু ফেলতে গিয়েও থুতু ফেলতে পারলাম না। চোখ পড়ল দেওয়াল জুড়ে পানের পিক, কফ সেঁটে আছে। গা ঘিন ঘিন করে উঠল। ঘরে ঢুকে চেয়ারে বসেও শান্তি পেলাম না। ঘরের মধ্যে জমে আছে ধুলো, ছেঁড়া কাগজ, সিগারেটের টুকরো, মরা আরশোলা। এরমধ্যে কি করে লোকে কাজ করে! আমি কি করে কাজ করব! তবে মুখ্যমন্ত্রী আমার জ্যাঠামশাই। এই আমার একমাত্র সান্ত্বনা। জ্যাঠামশাই একদিন আমাকে যেতে বলেছেন। যেতে হবে একদিন।

সারাদিন এই নোংরা অফিসে কাজ করে সন্ধেবেলা যথারীতি বাড়ি ফিরলাম। বাড়ি ফিরতেই আবার মন খারাপ হয়ে গেল। জ্যাঠামশাই কিছুই করেননি। যেখানে যেমন আবর্জনা পড়ে ছিল, মড়া পড়েছিল, সেখানে তেমনিই সব পড়ে আছে। উল্টে আরো মরা কুকুর, বেড়াল, ও মানুষের সংখ্যা

বেড়েছে। বুঝতে পারলাম না এত মানুষ খুন হচ্ছে কেন ? আর কারাই বা খুন করছে ? কেন খুন করছে ? সত্যি, গোটা শহর ভয়াবহ হয়ে উঠেছে।

মিনু বলল, কি হল ? তোমার জ্যাঠামশাই তো কিছুই করলেন না !

—ভুলে গেছেন বোধহয়।

—যাই হোক, আমি আর এখানে থাকব না।

—কোথায় যাবে ?

—অন্য পাড়াতে ঘর দেখ।

—সব পাড়াতেই হয়তো এই এক অবস্থা।

—তাহলে কাল আমাকে কৃষ্ণনগর রেখে এস। আমি কলকাতায় থাকতে পারব না।

এমন সময় ডোর-বেলের শব্দ। দরজা খুলতেই দেখি মিস্টার সেন, বাড়ি-ওয়ালা এবং মিস্টার দত্ত।

মিস্টার দত্ত বললেন, কি ব্যাপার ! আপনার জ্যাঠামশাই তো কিছুই করলেন না।

—কিছু বুঝতে পারছি না।

—আপনি আর একবার ফোন করুন। আমার বউ অসুস্থ হয়ে পড়েছে।

—চলুন।

এবার মিস্টার দত্তর ফ্ল্যাটে ঢুকে ফোন করলাম। জ্যাঠামশাই তাঁর দপ্তরেই ছিলেন।

—জ্যাঠামশাই, আমি বলু।

—আবার কি হল ?

—আমরা দুর্গন্ধে টিকতে পারছি না। সবাই অসুস্থ হয়ে পড়ছে। একটা কিছু করুন। আপনি সকালে বললেন···

—কি বলেছি ?

—আপিন বললেন দেখছি কি করা যায়।

—আমি দেখিনি, কি করে জানলে ?

—যেমনকার আবর্জনা তেমনি পড়ে আছে। তাই...

—মিথ্যে কথা। তোমাদের পাড়ায় কোনও আবর্জনা নেই। কোন মড়া পড়ে নেই। আমি সব খবর নিয়েছি।

—আপনাকে মিথ্যে খবর দিয়েছে।

—মিথ্যে খবর। কি বলছ তুমি।

—আমার কথা বিশ্বাস না হয় দেখে যান।

—আমার সময় নেই।

—তাহলে পাড়ার সকলের সই নিয়ে আপনার কাছে একটা দরখাস্ত নিয়ে যাব?

—ওহ্! এতদূর গড়িয়েছে। আমি তাহলে ঠিকই শুনেছি।

—কি শুনেছেন?

—তুমি দল তৈরী করে আমাদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করছ।

—সম্পূর্ণ বাজে কথা।

—প্রমাণ দিতে পার?

—পারি।

—ঠিক আছে। কাল সকাল সাড়ে দশটায় আমার এখানে চলে এস। আমি দেখতে চাই কি প্রমাণ তুমি দিতে পার।

জ্যাঠামশাই ফোন ছেড়ে দিলেন। বুঝলাম, জ্যাঠামশাই খুব উত্তেজিত হয়ে আছেন। আমাদের পাড়ায় যে আবর্জনা পচছে, মড়া পচছে তা তাঁর বিশ্বাস হচ্ছে না। আমি খুব সমস্যায় পড়ে গেলাম। কারণ, তাঁর ধারণা হয়েছে তাঁর দলের বিরুদ্ধে আমি চক্রান্ত করছি। নাহ্! কাল আমায় এমন প্রমাণ দিতে হবে যাতে তিনি খুশি হন। কিন্তু কি এমন প্রমাণ দেওয়া যায়! কি প্রমাণ পেলে তিনি খুশি হবেন!

মিস্টার দত্ত এ সময় জিজ্ঞেস করলেন, আপনার জ্যাঠমশাই কি বললেন?

—জ্যাঠামশাইয়ের আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না।

—কি কথা?

—আমাদের পাড়ায় আবর্জনা পচছে, মড়া পচছে।

—সে কি! চলুন কাল আমি আপনার সঙ্গে যাব।

একথায় মিস্টার সেন বললেন, আমিও যাব।

বাড়িওয়ালাও বললেন, আমিও। আমরা সাক্ষী দেব। আপনার কোন চিন্তা নেই।

আমি নিশ্চিন্ত হলাম। কিন্তু মিনুকে নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়লাম। সারারাত বমি করে করে অসুস্থ হয়ে পড়ল। আমিও দুর্গন্ধ সহ্য করতে না পেরে কয়েকবার বমি করলাম।

যাইহোক, পরদিন সকাল সাড়ে দশটায় আমি মিস্টার সেন, মিস্টার দত্ত ও বাড়িওয়ালাকে নিয়ে জ্যাঠামশাইয়ের সঙ্গে দেখা করলাম।

জ্যাঠামশাই আমাদের বসতে বললেন। আমরা তাঁর মুখোমুখি বসলাম।

জ্যাঠামশাই জিজ্ঞেস করলেন, কি প্রমাণ এনেছ ?

—আমি সাক্ষী এনেছি

জ্যাঠামশাই মিস্টার সেন, মিস্টার দত্তও বাড়িওয়ালার দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বললেন, এঁরা তোমার সাক্ষী ?

—হ্যাঁ।

—কিন্তু আমি যদি বলি এঁরা আসতে চাননি, তুমি এঁদের ঘুষ দিয়ে এনেছ ?

—ঘুষ দিয়ে ? কি বলছেন আপনি ?

আমি ঠিক বলছি—বলে হঠাৎ বাড়িওয়ালাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি বুকে হাত দিয়ে বলতে পারেন যে আপনি স্বেচ্ছায় এসেছেন ?

বাড়িওয়ালা থতমত খেয়ে বললেন, তা ঠিক আসিনি।

—তাহলে কিজন্য এসেছেন ?

—উনি আপনাকে বলে যদি আমার ছেলের চাকরির ব্যবস্থা করে দেন তাই ওঁকে খুশি করতে এসেছি।

আমি বাড়িওয়ালার মুখে এরকম কথা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

জ্যাঠামশাই এবার মিস্টার সেনকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কেন এসেছেন ?

মিস্টার সেন বললেন, আমিও ওঁকে খুশি করবার জন্যে এসেছি। উনি যদি আপনাকে ধরে আমার ছোট শালার একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দেন।

জ্যাঠামশাই এবার মিস্টার দত্তকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনিও নিশ্চয় ঐরকম কোন কারণে এসেছেন ?

—হ্যাঁ।

জ্যাঠামশাই একথার পর হো হো করে হেসে উঠলেন। বললেন, দেখলে তো, তুমি এঁদের ঘুষ দিয়ে এনেছ কিনা।

অপমানে ও লজ্জায় আমার মাথা নিচু হয়ে গেল। তবু বললাম, কিন্তু ঘুষতো দিইনি।

—কাউকে চাকরির আশ্বাস দেওয়া মানে একধরনের ঘুষ দেওয়া।

—ঠিক আছে। আমি আপনাকে অন্য প্রমাণ দেব।

—তাই দিও।

আমি তারপর বাড়িওয়ালা, মিস্টার সেন ও মিস্টার দত্তকে ফেলে রেখে একাই ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। এঁদের মুখ দেখতেও আমার ঘেন্না হচ্ছিল। তবে আমি প্রমাণ করে ছাড়ব, আমাদের পাড়ায় আবর্জনা পচছে, মড়া পচছে। এবং এর জন্যে যা কিছু করা দরকার তাই করব।

দুদিন পরে আমি আবর্জনা ও মড়ার ছবি তুলে নিয়ে গেলাম। এটা আমার দ্বিতীয় প্রমাণ।

জ্যাঠামশাই ছবি দেখে বললেন, এ ছবি কলকাতার কোন পাড়ার নয়। এ ছবি করাচির কিংবা ঢাকার, পাটনার কিংবা কাশীর।

আমি তর্ক না করে চলে এলাম। আমি জ্যাঠামশাইকে আরো প্রমাণ দেব। জ্যাঠামশাইয়ের কত প্রমাণ চাই ?

তৃতীয় প্রমাণ :

খবরের কাগজের কাটিং নিয়ে গিয়ে জ্যাঠামশাইকে দেখালাম। জ্যাঠামশাই বললেন, এসব খবর ঘরে বসে লেখা।

চতুর্থ প্রমাণ :

আমি একটা বড় টিনের কৌটোয় আবর্জনা নিয়ে গিয়ে জ্যাঠামশাইকে দেখালাম। জ্যাঠামশাই বললেন, এ তুমি বাইরে থেকে আনিয়েছ।

পঞ্চম প্রমাণ :

দুর্গন্ধে বমনরত অবস্থায় মিনুকে নিয়ে গিয়ে জ্যাঠামশায়ের সামনে হাজির করলাম। জ্যাঠমশাই বললেন, বৌমার ছেলে হবে, তাই বমি করছে।

আমি এতেও ক্ষান্ত হলাম না। একটার পর একটা প্রমাণ দিতে লাগলাম। দিতে দিতে যখন এক লক্ষ এক-এ গিয়ে ঠেকলাম তখন চমকে উঠলাম। দেখি জ্যাঠামশাইয়ের চেয়ারে আমি বসে আছি। আর আমার চেয়ারে জ্যাঠামশাই বসে আছেন। মনে করতে পারলাম না জ্যাঠামশাইয়ের বিরুদ্ধে লড়াই করতে করতে আমি কখন মুখ্যমন্ত্রী হয়ে গেছি। শুধু তাই নয়, আমি আর দুর্গন্ধ নিয়ে কোনও কথা বলছি না। জ্যাঠামশাইয়ের সঙ্গে আমার কথাবার্তা এখন এইরকম :

জ্যাঠামশাই : গোটা দেশটাকে তুমি নরক করে তুলেছ।

আমি : প্রমাণ দিতে পারেন ?

জ্যাঠামশাই : রাস্তায় রাস্তায় এত আবর্জনার গন্ধ, পচা কুকুর-বেড়াল মানুষের গন্ধ যে, হাঁটা যায় না।

আমি : প্রমাণ দিতে পারেন?

জ্যাঠামশাই : রোজ মানুষ খুন হয়ে মরছে, আগুনে পুড়ে মরছে, বন্যায় মরছে, ভুল চিকিৎসায় মরছে, বিনা চিকিৎসায় মরছে।

আমি : প্রমাণ দিতে পারেন?

জ্যাঠামশাই : দিন দিন বেকার সমস্যা বাড়ছে, খাদ্য সমস্যা বাড়ছে, গৃহ সমস্যা বাড়ছে।

আমি : প্রমাণ দিতে পারেন?

জ্যাঠামশাই : দেশে আর একজনও প্রকৃত বৈজ্ঞানিক নেই, ডাক্তার নেই, সাহিত্যিক নেই, সম্পাদক নেই, খেলোয়াড় নেই, গায়ক নেই, উকিল নেই, পুলিশ নেই।

আমি : প্রমাণ দিতে পারেন?

জ্যাঠামশাই : তুমি প্রমাণ চাও?

আমি : হ্যাঁ, আমি প্রমাণ চাই।

জ্যাঠামশাই একথায় ভীষণ উত্তেজিত হয়ে টেবিল চাপড়ে বললেন, ফুঃ।

আমিও ভীষণ উত্তেজিত হয়ে টেবিল চাপড়ে বললাম, ফুঃ।

হিপ হিপ হুর্‌রে

দেশের দারিদ্র্য দূর করতে গিয়ে পরপর তিনজন প্রধানমন্ত্রী হার্ট অ্যাটাকে মারা গেলেন। রাষ্ট্রপতি ভীষণ সমস্যায় পড়ে গেলেন। আবার নতুন প্রধানমন্ত্রী চাই। মন্ত্রীরা দুবেলা রাষ্ট্রপতির বাড়ি যাতায়াত করতে লাগলেন। রাষ্ট্রপতি সকলের কথা মন দিয়ে শুনলেন। কিন্তু কাউকে তাঁর পছন্দ হলনা। তিনি ভাবতে লাগলেন কী করা যায়। একবার ভাবলেন বিদেশ থেকে প্রধানমন্ত্রী ভাড়া করে আনবেন। কারণ এদেশের লোকের হার্ট বড় দুর্বল। দারিদ্র্য দূর করার মত শক্ত হার্ট এদের নেই। তার পর একটু সদয় হয়ে ভাবলেন এদেশের লোককে একটা শেষ সুযোগ দেওয়া যাক। সে যদি দারিদ্র্য দূর করতে পারে তো ভাল, নইলে বিদেশ থেকে প্রধানমন্ত্রী আনা যাবে। তাই তিনি শেষ পর্যন্ত ভেবেচিন্তে কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দিলেন: প্রধানমন্ত্রী পদের জন্য দেশের নাগরিকদের নিকট হইতে দরখাস্ত আহ্বান করা হইয়াছে। প্রার্থীকে অবশ্যই দারিদ্র্যদূরীকরণে পারদর্শী হইতে হইবে। প্রার্থীরা তাঁহাদের বয়স, শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার উল্লেখ করিয়া আবেদন করুন। আবেদনের শেষ তারিখ সাত জুলাই, উনিশশো...।

এই বিজ্ঞাপন প্রকাশের পর দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে লক্ষ লক্ষ আবেদন পত্র এল। রাষ্ট্রপতি অত্যন্ত ব্যস্ত মানুষ। তাঁর এত আবেদনপত্র পড়ার সময় নেই। তিনি তাই লক্ষ লক্ষ আবেদনপত্রের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে পাঁচটা আবেদন-পত্র টেনে নিলেন। তারপর তাঁদের চিঠি দিলেন, ইন্টারভিউ নিলেন। তাঁদের সকলকে জিজ্ঞেস করলেন, প্রধানমন্ত্রী বানান কী? একজন ছাড়া কেউ সঠিক বানান বলতে পারল না। রাষ্ট্রপতি তাঁকেই প্রধানমন্ত্রী পদে নিয়োগ করলেন। তবে নিয়োগ পত্রে লিখলেন, সাত বছরের মধ্যে দেশ থেকে দারিদ্র্য দূর করতে হবে। না পারলে প্রধানমন্ত্রী পদ থেকে বরখাস্ত করা হবে। নতুন প্রধানমন্ত্রী সানন্দে তা মেনে নিলেন।

২

নতুন প্রধানমন্ত্রী বয়সে তরুণ, অবিবাহিত এবং উদ্যোগী। কয়েকদিনের মধ্যে তিনি তাঁর সব দায়-দায়িত্ব বুঝে নিলেন। শুধু তাই নয়, তিনি আস্তে

আস্তে সাংবাদিকদের মত সর্ববিদ্যায় পারদর্শী হয়ে উঠলেন। এমন একসময় এল যখন যে-কোনো বিষয়ে তাঁর মতটাই শেষ কথা হিসেবে বিবেচিত হতে লাগল। তিনি বৈজ্ঞানিকদের সভায় গিয়ে বললেন, এ যুগ ধর্মের যুগ নয়, সাহিত্যের যুগ নয়; এ যুগ বিজ্ঞানের যুগ। আজকের এই আশ্চর্য সভ্যতাকে বিজ্ঞান সৃষ্টি করেছে। আমরা তার জন্যে বিজ্ঞানের কাছে ঋণী। বিজ্ঞানীদের কাছে আমার আবেদন তাঁরা যেন বিজ্ঞানকে ধ্বংসের কাজে না লাগিয়ে সর্বতোভাবে মানবকল্যাণমুখী করে তোলেন। ইত্যাদি ইত্যাদি। সাহিত্যিকদের সভায় গিয়ে বললেন, একদিন মানুষ নিজের সুখের কথা ভেবেই বিজ্ঞানের চর্চায় আত্মনিয়োগ করেছিল। কিন্তু সেই বিজ্ঞান আজ দানব হয়ে মানুষকেই হত্যা করতে উদ্যত হয়েছে। মানুষ আজ বিজ্ঞানের ভয়ে ভীত, মৃতপ্রায়। মানুষের এই সংকটের হাত থেকে এখন কে মুক্তি দিতে পারে? কে তার মধ্যে জ্বেলে দিতে পারে বিশ্বাসের আলো? হ্যাঁ, সাহিত্যিকরাই তা পারেন। ইত্যাদি ইত্যাদি। ধর্ম প্রচারকদের সভায় গিয়ে বললেন, আমরা এখন এমন এক ভয়ংকর যুগে বাস করছি যে যুগে বিজ্ঞান মানুষের কাছে আতঙ্ক। অথচ সাহিত্যিকদের কাছ থেকে আমরা কোনো আশ্বাসের ছবি পাচ্ছি না। তাঁদের লেখায় ফুটে উঠছে কেবল অবক্ষয়ের ছবি। সাহিত্য আজ হয়ে উঠেছে একটা পণ্যসামগ্রী, একটা সর্বনাশা অপসংস্কৃতি। এ যুগে কোথাও আশা নেই, ভরসা নেই। চার-দিকে এখন শুধু বিদ্বেষের ও অবিশ্বাসের কুটিলতা। ধর্মই পারে এই অবস্থা থেকে আমাদের মুক্তি দিতে। ধর্মই আজ আমাদের কাছে একমাত্র আশ্রয়। ইত্যাদি ইত্যাদি। আর লক্ষ লক্ষ দরিদ্র মানুষের জনসভায় গিয়ে তিনি বললেন, আমি এসে গিয়েছি। আপনাদের ভয় নেই। আপনাদের দারিদ্র্য দূর করাটা আমার জীবনের একমাত্র ব্রত।

হিপ হিপ হুররে!

৩

আগেই বলা হয়েছে, আমাদের প্রধানমন্ত্রী তরুণ, অবিবাহিত এবং উদ্যোগী। তিনি দিবারাত্র চিন্তা করতে লাগলেন দেশের দারিদ্র্য কীভাবে দূর করা যায়। ভাবতে ভাবতে তিনি হঠাৎ একদিন রাত্রির অন্ধকারে চেঁচিয়ে উঠলেন, ইউরেকা! ইউরেকা! তিনি বুঝতে পারলেন শিল্পে অনগ্রসরতাই

আমাদের দারিদ্র্যের একমাত্র কারণ। দিকে দিকে শিল্পনগরী স্থাপন করতে পারলে দেশের দারিদ্র্য দূর হতে বাধ্য। এই নতুন উপলব্ধি নিয়ে সারারাত তাঁর উত্তেজনায় কেটে গেল। ভাল করে ঘুমোতে পর্যন্ত পারলেন না। পরদিন জাতির উদ্দেশে টেলিভিশনে তাঁর এই নতুন উপলব্ধি জানানোর পর তবে শান্ত হলেন। দেশবাসীও তাঁকে বাহবা দিল। সমস্ত কাগজেই লেখা হল, আমরা এতদিনে একজন যোগ্য প্রধানমন্ত্রী পেয়েছি।

আমাদের প্রধানমন্ত্রীর কথার সঙ্গে কাজের অমিল নেই। তিনি দেশের বিভিন্ন প্রান্তে শিল্পনগরী গড়ে তোলার কাজে নেমে পড়লেন। কোটি কোটি টাকা খরচ হতে লাগল। কোথাও হতে লাগল ইস্পাত তৈরির কারখানা, কোথাও হতে লাগল ইলেকট্রনিক্সের কারখানা। কোথাও হতে লাগল কাপড় তৈরির কারখানা. কোথাও হতে লাগল সাবান তৈরির কারখানা। সারা দেশ জুড়ে কারখানা তৈরির মহোৎসব শুরু হয়ে গেল।

কিন্তু গরীবেরা বড় অবুঝ। তাদের অভাব অনটন যত বাড়তে লাগল, তারা ততই মরিয়া হয়ে উঠল। ধৈর্য ধরে কয়েকটা বছর পেট চেপে অপেক্ষা করতে পারল না। গ্রাম ছেড়ে দলে দলে শহরে আসতে লাগল। যেখানে পারল ঝুপড়ি গড়ে তুলল। তারপর তাদের কেউ চুরি করতে লাগল, কেউ ছিনতাই করতে লাগল, কেউ চোরাই মাল বেচতে লাগল। আর যারা গ্রামে থেকে গেল তারা দুবেলা কপাল চাপড়াতে লাগল। কোথাও তাদের কাজ নেই, খাবার নেই। তারা গাছের শিকড় তুলে সিদ্ধ করে খেতে লাগল।

একদিন প্রধানমন্ত্রীর কানে এই গরীব মানুষদের কথা গিয়ে পৌঁছল। সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাদের উদ্দেশে ভাষণ দিলেন। সে ভাষণে বললেন, আপনারা এতকাল দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করেছেন। আরো দুটো বছর করুন। তারপর দেশে অভাব বলে কিছু থাকবে না, দারিদ্র্য বলে কিছু থাকবে না। যদি থাকে তাহলে আমি পদত্যাগ করব। ইত্যাদি ইত্যাদি।

৪

যাই হোক, শেষ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্ন সফল হল। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে গড়ে উঠল নতুন নতুন কারখানা। প্রধানমন্ত্রী একটি ইলেকট্রনিক্সের কারখানা উদ্বোধন করতে গিয়ে বললেন, একদিন যে দারিদ্র্য আমাদের কুরে-কুরে খাচ্ছিল, আজ তা নিশ্চিহ্ন। এখন আর দেশের সুদূরতম অঞ্চলেও কোনো

লোক উপোস করে থাকে না। আমার এইটুকুই আনন্দ যে আমি সমগ্র দেশবাসীর মুখে হাসি ফোটাতে পেরেছি। আর যদি কোন নিন্দুক বলে বেড়ান দেশে এখনো দারিদ্র্য আছে, তাহলে তার নিস্তার নেই। আমি তাকে গুলি করে মারব।

চতুর্দিকে ধন্য ধন্য পড়ে গেল। নানা দেশ থেকে প্রধানমন্ত্রীর আমন্ত্রণ আসতে লাগল। সেই আমন্ত্রণ রক্ষা করবার জন্যে তিনি দেশ বিদেশ ঘুরতে লাগলেন। ঘুরতে ঘুরতে একসময় প্যারিসে এসে পৌঁছলেন। সেখানে এসে এক অদ্ভুত চেহারার তরুণীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হল। তার সবকিছুই মেয়েদের মত। কিন্তু মাথাটা ছাগলের। সে মানুষের ভাষায় কথা বলে, মানুষের মত চলাফেরা করে। কিন্তু খাওয়া দাওয়া মানুষের মত নয়। তার একমাত্র খাদ্য বই। বই ছাড়া সে কিছু খেতে ভালোবাসে না। আমাদের তরুণ প্রধানমন্ত্রী তার রূপে মুগ্ধ হলেন, তার কথাবার্তায় মুগ্ধ হলেন। তাকে আদর করে নতুন নাম দিলেন, প্রীতি। প্রীতিরও আমাদের প্রধানমন্ত্রীকে ভালো লাগল। তারপর তাদের বিয়ে হল। প্রধানমন্ত্রী বিয়ের পর হানিমুন করতে সুইজারল্যাণ্ড গেলেন। সেখানে সাতদিন থেকে প্রীতিকে নিয়ে দেশে ফিরলেন। ফেরার পথে প্রীতি প্রধানমন্ত্রীকে জিজ্ঞেস করল, তোমাদের দেশ খুব বড়?

প্রধানমন্ত্রী বললেন, হ্যাঁ।

—ওখানে লেখক আছে?

—হ্যাঁ।

—প্রচুর বই লেখা হয়?

—হ্যাঁ।

—তাহলে কোনো চিন্তা নেই।

—না, কোনো চিন্তা নেই।

—আমি রোজ কটা বই খাই জানো তো?

—কটা?

—দশটা। রোজ দশটা বই আমার চাই।

প্রধানমন্ত্রী হেসে বললেন, বই নিয়ে তোমার চিন্তা করতে হবে না। সে দায়িত্ব আমার।

৫

প্রীতির রূপে ও গুণে সমগ্র দেশবাসীও মুগ্ধ হয়ে গেল। রোজ কাগজে প্রীতির ছবি ছাপা হতে লাগল।

এই সময় একদিন এক সাংবাদিক এসে হাজির হলেন। তিনি দীর্ঘ তিন-ঘণ্টা ধরে প্রীতির সাক্ষাৎকার নিলেন। এই দীর্ঘ সাক্ষাৎকারের পুরো বিবরণের প্রয়োজন নেই। যেটুকু প্রয়োজন শুধু সেটুকু নিচে তুলে দেওয়া হল :

সাংবাদিক : আপনার জন্ম কোথায় ?

প্রীতি : প্যারিসে।

সাংবাদিক : আপনার বাবা কে ?

প্রীতি : রবার্ট জোনস।

সাংবাদিক : আমেরিকান ?

প্রীতি : হ্যাঁ।

সাংবাদিক : মা ?

প্রীতি : আমার মা একজন রাশিয়ান। নাম : নাদেঝদা পাভলোভনা।

সাংবাদিক : আপনার মা-বাবার মধ্যে দেখাসাক্ষাৎ কি প্যারিসেই হয়েছিল ?

প্রীতি : হ্যাঁ। সেখানেই তাঁদের মধ্যে ভালোবাসা হয়, বিয়ে হয়, আমার জন্ম হয়। তারপর একদিন তাঁদের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয়। তাঁরা আমাকে পরিত্যাগ করে যে যার দেশে চলে যান। তখন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট আমাকে কন্যা-স্নেহে মানুষ করতে থাকেন।

সাংবাদিক : আপনার বাবা মা কি এখনো জীবিত ?

প্রীতি : না। দু-তিন বছর হল মারা গেছেন।

সাংবাদিক : আপনার বাবা-মা দুজনেই কি মনুষ্য-বংশীয় ?

প্রীতি : হ্যাঁ।

সাংবাদিক : তাহলে আপনার মুখটা কেন মানুষের মত হল না ?

প্রীতি : প্রকৃতির খেয়াল।

সাংবাদিক : প্যারিসের জন্য আপনার মন খারাপ করে না ?

প্রীতি : মাঝে মাঝে করে।

সাংবাদিক : আমরা শুনেছি বই আপনার একমাত্র খাদ্য।

প্রীতি : ঠিক শুনেছেন।

সাংবাদিক : আপনি সাধারণত কি ধরনের বই খেতে ভালোবাসেন ?

প্রীতি : গল্প, উপন্যাস, নাটক, কবিতা ও প্রবন্ধের বই খেতে ভালবাসি। তবে মন্ত্রীদের ছাপা বক্তৃতা খেতে সবচেয়ে ভালোবাসি।

সাংবাদিক : প্রধানমন্ত্রীর ছাপা বক্তৃতা খেতে কেমন লাগে ?

প্রীতি : খুউব ভালো লাগে।

সাংবাদিক : রাষ্ট্রপতির বক্তৃতা ?

প্রীতি : সেও খুব ভালো।

সাংবাদিক : আপনার বদহজম হয় না ?

প্রীতি : আজ পর্যন্ত হয়নি।

সাংবাদিক : এ দেশের মানুষদের সবচেয়ে কোন জিনিস আপনাকে মুগ্ধ করেছে ?

প্রীতি : আমার পিতৃভূমি এবং মাতৃভূমির প্রতি এদেশের মানুষের অপরিসীম শ্রদ্ধা।

সাংবাদিক : কী রকম ?

প্রীতি : কিছুদিন আগে দুজনের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। কথায় কথায় একজন বলল তার বাবা রেগন। আর একজন বলল তার বাবা গোরবাচেভ। শুনে আমার ভীষণ ভালো লেগেছিল।

সাংবাদিক : আজ আসি। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

প্রীতি : ধন্যবাদ। আবার আসবেন।

৬

তখন প্রধানমন্ত্রী প্রীতির কাছ থেকে হাজার মাইল দূরে। তিনি এক বিশাল জনসভায় বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। তিনি বলছিলেন, আমি একদিন আপনাদের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, এ দেশের বুক থেকে দারিদ্র্য দূর করবই। আপনারা দেখেছেন আমি সে প্রতিজ্ঞা রেখেছি। দেশে আজ আর কোথাও দারিদ্র্য নেই। কিন্তু আমি দেশের বুক থেকে রোগ দূর করতে পারছি না। এ আমার লজ্জা, আমাদের লজ্জা। আমি আবার প্রতিজ্ঞা করছি, আগামী কয়েক বছরের মধ্যে কলেরা, টাইফয়েড, আমাশা, ইনফ্লুয়েঞ্জা,

টিবি, ক্যান্সার বলে কিছু থাকবে না। শব্দগুলো তখন শুধু বইয়ের পাতায় থাকবে। ইত্যাদি ইত্যাদি।

এমন সময় প্রধানমন্ত্রীর হাতে একটি চিরকুট এসে পৌঁছলো। চিরকুটে লেখা, স্ত্রী অসুস্থ। শিগগির চলে আসুন।

প্রধানমন্ত্রীর ইচ্ছে ছিল টানা দেড় ঘন্টা বক্তৃতা দেবেন। কিন্তু স্ত্রীর অসুস্থতার খবর পেয়ে দেড়ঘণ্টার বক্তৃতা আধ ঘণ্টায় সারলেন। সেরে দ্রুত বাড়ি চলে এলেন। এসে দেখেন তাঁর আদরের প্রীতি বিছানায় শুয়ে আছে। আর থেকে থেকে বমি করছে। বিছানার চারপাশে উদ্বিগ্ন মুখে ঘিরে আছে ডাক্তার আর নার্স।

প্রধানমন্ত্রী প্রীতির মাথার পাশে এসে বসলেন। তার কপালে হাত বুলোতে বুলোতে আদর করে ডাকলেন, প্রীতি!

প্রীতির চোখ খোলার ক্ষমতা ছিল না। চোখ বন্ধ করেই বলল, হুঁ।

—তোমার কোথায় কষ্ট হচ্ছে?

—পেটে।

—খুব?

—খু-উ-ব।

—কী খেয়েছিলে?

—একটা গল্পের বই।

—কোন গল্পের বই?

প্রীতির মাথার বালিশের নিচে একটা ছোট গল্পের বই ছিল। প্রীতি সেটা বের করল। প্রধানমন্ত্রী বইটা প্রীতির কাছ থেকে নিয়ে ওল্টাতে লাগলেন। দেখলেন বইটাতে এখনো অনেকগুলো গল্প অক্ষত আছে। বইটার নাম 'অম্লমধুর'। লেখকের নাম নরেন পালিত। প্রধানমন্ত্রী বইটার শেষ গল্পটি ওখানে বসেই পড়তে শুরু করলেন। গল্পটির নাম : কচু। গল্পটি এভাবে শুরু হয়েছে!

এক যে ছিল দেশ। সে দেশের লোকেরা ভারি গরীব। একদিন প্রধানমন্ত্রী তাদের দুঃখে কাতর হয়ে বললেন, তোমরা গরীব মানুষ। তোমরা কচুর চাষ কর। দেখবে তোমাদের আর খাওয়া-পরার অভাব হবে না। কিন্তু এক মন্ত্রী কচুর চাষের বিরোধিতা করে বসলেন। তিনি সকলকে কলার চাষ করতে বললেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী তাঁকে মন্ত্রীর পদ থেকে সরিয়ে দিলেন।

শুধু তাই না…

প্রধানমন্ত্রীর আর পড়বার প্রবৃত্তি হল না। এটুকু পড়েই ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন ; কিন্তু এখন যেহেতু ক্রোধ দেখানো উচিত নয়, তাই চুপ করে রইলেন। নিজেকে শান্ত করে ঠিক করলেন, প্রীতি সুস্থ হলেই লেখককে ডেকে পাঠাবেন। তারপর তাঁকে ফাঁসিতে লটকাবেন।

৭

কয়েকদিনের মধ্যে প্রীতি একটু সুস্থ হয়ে উঠল। প্রধানমন্ত্রী আর দেরি করলেন না। লেখককে ডেকে পাঠালেন। লেখক এসে হাজির হলেন। একটি ঘরে তাঁকে বসানো হল। তারপর প্রধানমন্ত্রী ঘরে ঢুকলেন। লেখক উঠে দাঁড়ালেন।

প্রধানমন্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন, 'অম্লমধুর' কি আপনার লেখা ?

লেখক বললেন, হ্যাঁ।

—আপনি এ বই লিখেছেন কেন ?

—দেশের দুঃখ-দারিদ্র্যকে তুলে ধরার জন্যে।

—দুঃখ-দারিদ্র! আমাদের দেশে কোনো দুঃখ-দারিদ্র্য নেই।

—কী বলছেন!

—ঠিক বলছি। এখন আর কোথাও দুঃখ-দারিদ্র্য নেই, কোথাও অভাব অনটন নেই। সবাই সুখে শান্তিতে আছে।

—কেউ সুখে নেই।

—আবার! আপনি লেখক। আপনি তো মিথ্যেবাদী। বই বিক্রির জন্যে যা খুশি লিখেছেন। যত পেরেছেন ভেজাল দিয়েছেন।

—মোটেই না। আমার বইতে কোনো ভেজাল নেই।

—তাহলে আমার স্ত্রী আপনার বই খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ল কেন ?

—তার জন্যে আমি কী করব ?

—আপনার বই, অতএব আপনার দায়িত্ব।

—আপনি কী বলতে চান ?

—আমাদের দেশে খাদ্যে ভেজাল দিলে কী হয় ?

—কিছুই হয় না।

—ঠিক। বইতে ভেজাল দিলে ?

—তাতেও কিছুই হয় না।

—এটাও ঠিক। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রী যদি ভেজাল দেওয়া বই খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ে, তখন ওই বইয়ের লেখকের একমাত্র শাস্তি হয় মৃত্যুদণ্ড—তাই না?

—বিচার ছাড়াই?

—ওহ্! বিচার চাই। ঠিক আছে, বিচার একটা হবে।

—কিন্তু আপনি তো জানেন লেখকদের মৃত্যু নেই। লেখকরা অমর।

—হাঃ।

৮

গণতান্ত্রিক দেশ। এখানে বিনা বিচারে কাউকে শাস্তি দেওয়া যায় না। অতএব প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে লেখকের বিচারের আয়োজন করা হল। সরকারী পক্ষের উকিল তাঁকে একের পর এক জেরা করতে লাগলেন। লেখক উত্তর দিতে লাগলেন। প্রশ্ন ও উত্তর মোটামুটি এইরকম:

প্রশ্ন: আপনি নরেন পালিত?

উত্তর: হ্যাঁ।

প্রশ্ন: 'অম্লমধুর' বইটি আপনার লেখা?

উত্তর: হ্যাঁ।

প্রশ্ন: আপনার কি আরো বই আছে?

উত্তর: আমার আরো পাঁচটা বই আছে।

প্রশ্ন: আপনি কী করেন?

উত্তর: একটা সাধারণ অফিসে চাকরি করি।

প্রশ্ন: ওই চাকরি থেকে কী সংসার চলে না?

উত্তর: চলে।

প্রশ্ন: তাহলে বই লেখার বাতিক দেখা দিল কেন?

উত্তর: আমার কিছু বলার আছে। আমি তাই লিখতে শুরু করলাম।

প্রশ্ন: এবং একের পর এক মানুষ খুন করতে লাগলেন।

উত্তর: আমি!

প্রশ্ন: হ্যাঁ, আপনি। আপনার ছোট গল্প খেয়ে প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রী প্রীতি দেবী, যাঁর অসম্ভব হজম শক্তি, তিনি পর্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। আর

আপনার উপন্যাস পড়ে কতলোক যে মারা গেছে তার ঠিক নেই।

উত্তর : প্রমাণ ?

প্রশ্ন : প্রমাণ চাই।

তারপর একে একে পনের জন সাক্ষী বিচারকের সামনে এসে সাক্ষ্য দিয়ে গেল।

১ম সাক্ষী : হুজুর! ওনার বই পড়ে আমার ভাই কলেরায় মারা গেছে।

২য় সাক্ষী : হুজুর! ওনার বই পড়ে আমার ছেলে নিউমোনিয়ায় মারা গেছে।

৩য় সাক্ষী : হুজুর! ওনার বই পড়ে আমার শালা ট্রেনে কাটা পড়েছে।

৪র্থ সাক্ষী : হুজুর! ওনার বই পড়ে আমার স্ত্রী হার্ট অ্যাটাকে মারা গেছে।

এইভাবে একে একে পনের জনের সাক্ষ্য দেওয়া শেষ হল। হবার পর এল প্রীতি। প্রীতি আদালত কক্ষে ঢুকতেই চারদিকে চাঞ্চল্য দেখা দিল। সবাই, এমনকি বিচারপতিও তাঁকে সম্মান জানানোর জন্যে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর সকলে বসল। প্রীতি বলল, হুজুর, আমি বই পড়ি না, বই খাই। কিন্তু এদেশে এমন বাজে লেখক আছে যার বই আমি খেয়ে হজম করতে পারি নি। নরেন পালিত সেই লেখক যাঁর 'অম্লমধুর' বই পড়ে আমি শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছিলাম। এই দেখুন ডাক্তারের সার্টিফিকেট।

প্রীতি সার্টিফিকেট বিচারকের হাতে দিল।

বিচারক ভীষণ সমস্যায় পড়ে গেলেন। ডাক্তারের সার্টিফিকেট হাতে নিয়ে ভাবতে লাগলেন কী করা যায়? এমন সময় তাঁর হাতে একটা চিরকুট এল। চিরকুটে লেখা : লেখককে মৃত্যুদণ্ড দিতে দ্বিধা করিবেন না। করিলে আপনার মৃত্যুদণ্ড অবধারিত। বিচারক লেখাটা পড়ে আর এক মুহূর্ত দেরি করলেন না। লেখককে ফাঁসির হুকুম দিলেন।

৯

ভোর বেলা স্নান করিয়ে লেখককে নির্দিষ্ট দিনে ফাঁসির মঞ্চে নিয়ে যাওয়া হল। গলায় ফাঁসির দড়ি পরানো হল। ফাঁসুড়ে তার কাজ করল।

লেখকের পায়ের তলা থেকে পাটাতন সরে গেল। লেখক গলায় দড়ি নিয়ে গর্তের মধ্যে ঝুলে পড়লেন। আর তখনি একটা অলৌকিক ঘটনা ঘটে গেল। ফাঁসির দড়িটা গেল ছিঁড়ে। সঙ্গে সঙ্গে সবাই হই হই করে লেখককে গর্ত থেকে টেনে তুলল।

একজন বলল, দড়িটা তো নতুন ছিল।

একজন বলল, অসম্ভব। দড়িটা পচা ছিল।

একজন বলল, সে কী করে হবে? আমি নিজে দড়ি কিনেছি।

আর একজন বলল, তোমাকে ঠকিয়েছে।

লেখক এইসময় বলে উঠলেন, এক গ্লাস জল।

একজন দৌড়ে জল নিয়ে এল।

লেখক জল খেয়ে বললেন, আমাকে কি আবার ফাঁসি দেওয়া হবে?

একজন বলল, না বোধহয়।

লেখক বললেন, আমি তাহলে বাড়ি যাই?

—দাঁড়ান। প্রধানমন্ত্রী আগে কী বলেন সেটা জানা দরকার।

—কখন তা জানতে পারব?

এখনি।—বলে একজন প্রধানমন্ত্রীর কাছে ছুটল।

একটু পরে সে হাঁফাতে হাঁফাতে ফিরে এল।

লেখক ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, প্রধানমন্ত্রী কী বললেন?

—আপনাকে গাছে বেঁধে গুলি করার নির্দেশ দিয়েছেন।

লেখক রীতিমত অবাক হলেন, সত্যি!

—সত্যি না তো কি মিথ্যে।

লেখক তারপর আর কিছু বললেন না। সবাই তাঁকে টানতে টানতে একটা গাছের গায়ে দাঁড় করাল। লেখক চুপ করে রইলেন। সবাই তাঁকে গাছের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বাঁধল। লেখক টুঁ শব্দ করলেন না। তারপর তাঁকে পাঁচবার গুলি করা হল। কিন্তু এবারেও অলৌকিক ঘটনা ঘটল। লেখকের গায়ে একটা গুলিও লাগল না। আবার প্রধানমন্ত্রীর কাছে খবর গেল। প্রধানমন্ত্রী এবার লেখককে প্লেন থেকে ছুঁড়ে ফেলতে নির্দেশ দিলেন। লেখককে তখন প্লেন থেকে পাহাড়ে ছুঁড়ে ফেলা হল। তবু লেখকের কিছু হল না। তারপর লেখককে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে একে একে সমুদ্রে ফেলা হল, আগুনে ফেলা হল, পাগলা হাতির পায়ের নিচে ফেলা হল, রয়েল বেঙ্গল টাইগারের সামনে ফেলা হল।

তবু লেখকের কিছু হল না। লেখক অক্ষত শরীরে বেঁচে রইলেন।

প্রধানমন্ত্রী দিশেহারা হয়ে মাথার চুল ছিঁড়তে লাগলেন।

লেখক তা দেখে হেসে বললেন, আমি তো আপনাকে আগেই বলেছিলাম, লেখকের মৃত্যু নেই। লেখকরা অমর।

১০

প্রধানমন্ত্রী একটা গোপন সভা ডাকলেন। সভার আলোচ্য বিষয় : লেখকের মৃত্যু। সে সভায় রাষ্ট্রপতি এলেন, অর্থমন্ত্রী এলেন, রেলমন্ত্রী এলেন, তথ্য ও বেতারমন্ত্রী এলেন এবং এলেন আরো অনেকে। সকলেই গুরুগম্ভীর গলায় বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করলেন। কিন্তু কেউ কোনো সিদ্ধান্তে আসতে পারল না। শেষে রাষ্ট্রপতি বললেন, লেখককে মারার একটাই উপায় আছে।

সকলেই উদগ্রীব হয়ে জানতে চাইলেন, কী উপায় ?

—লেখককে দেশের সর্বোচ্চ সাহিত্য পুরস্কার দেওয়া।

—তাতে কী হবে ?

—তারপর সে আর বই লিখবে না। লিখলেও সে বই ক্ষতিকর হবে না। প্রীতি সহজেই তা খেয়ে হজম করতে পারবে।

—আপনি এটা কী করে জানলেন ?

—আমি দেখেছি নোবেল প্রাইজ পাওয়ার পর লেখকরা আর তেমন কিছু লিখতে পারে না।

—কিন্তু লোকটা তো বেঁচে থাকে।

—তাতে কী! লোকটা তখন রাম, শ্যাম, যদু ছাড়া কিছু নয়।

প্রধানমন্ত্রীর কাছে রাষ্ট্রপতির যুক্তিটা খুব সঙ্গত মনে হল। তিনি বললেন, রাষ্ট্রপতিজীর কথাটা ভাববার মতো। আমরা লেখককে পাঁচলাখ টাকার পুরস্কার দিই। দিয়ে দেখি কী হয়।

মন্ত্রীরা কেউ ভয়ে প্রধানমন্ত্রীর বিরোধিতা করতে সাহস করলেন না। সকলেই প্রধানমন্ত্রীকে সমর্থন জানিয়ে বললেন, হ্যাঁ, তাই করা হোক।

১১

একটা অনুষ্ঠান করে লেখককে পাঁচ লাখ টাকার পুরস্কার দেওয়া হল। পুরস্কার পেয়ে লেখক ভীষণ খুশি হলেন। কাগজে কাগজে তাঁর হাসিহাসি

মুখের ছবি ছাপা হল। এবং সত্যি, পুরস্কার পাওয়ার পর তাঁর লেখালিখি একদম বন্ধ হয়ে গেল। তিনি ফ্ল্যাট কেনা, গাড়ি কেনা, বিদেশ ঘোরা এবং বক্তৃতা দেওয়া নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। প্রধানমন্ত্রী নিশ্চিন্ত হলেন।

কিন্তু বছর ঘুরতে না ঘুরতে প্রীতি আবার অসুস্থ হয়ে পড়ল। আবার ডাক্তার ডাকা হল। এবার অসুস্থতার কারণ অন্য-এক লেখকের বই। বিষয়: দারিদ্র্য। প্রীতি আবার ওষুধ খেয়ে সুস্থ হয়ে উঠল। এবং ওই লেখক যাতে আর ওই ধরনের বাজে বই না লেখে তার জন্যে তাঁকে যথারীতি পাঁচলাখ টাকা পুরস্কার দেওয়া হল। লেখক পুরস্কার পেয়ে লেখালিখি ছেড়ে দিলেন। ফ্ল্যাট, গাড়ি, বিদেশ-ভ্রমণ, বক্তৃতা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

কিন্তু বছর ঘুরতে না ঘুরতে প্রীতি আবার আর-একজন লেখকের বই খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। এ বইয়েরও বিষয়: দারিদ্র্য।

প্রধানমন্ত্রী ভীষণ সমস্যায় পড়ে গেলেন। তিনি আবার গোপন সভা ডাকলেন। সে সভায় রাষ্ট্রপতি এলেন। এ ছাড়াও অর্থমন্ত্রী, রেলমন্ত্রী, তথ্য ও বেতারমন্ত্রী এলেন। সকলেই আলোচনা শুরু করে দিলেন।

প্রধানমন্ত্রী বললেন, আমরা যে পথ ধরেছি তাতে লেখকরা একে একে বড়-লোক হয়ে যাচ্ছে অথচ প্রীতি সুস্থ থাকছে না।

একজন বললেন, আমার মতে লেখকদের লেখালিখি বন্ধ করে দেওয়া উচিত।

প্রধানমন্ত্রী বললেন, এটা গণতান্ত্রিক দেশ। আমরা এখানে কারো মত প্রকাশের স্বাধীনতা হরণ করতে পারি না। আর লেখালিখি বন্ধ হয়ে গেলে প্রীতি খাবে কী!

আর একজন বললেন, যত বই বেরুচ্ছে সব বই প্রীতি দেবীর হাতে তুলে দেওয়া ঠিক নয়। বেছে বেছে ভালো ভালো বই প্রীতিদেবীর হাতে তুলে দেওয়া উচিত।

প্রধানমন্ত্রী বললেন, এটা করেও লাভ নেই। কারণ বাছাই করা বই এত সামান্য হবে যে তা খেয়ে প্রীতির পেট ভরবে না।

অন্য একজন বললেন, তাহলে উপায়টা কী? রাষ্ট্রপতির মতটা আমরা জানতে চাই।

রাষ্ট্রপতি বললেন, প্রধানমন্ত্রীর ধারণা দেশ থেকে দারিদ্র্য দূর হয়ে গেছে। কোথাও আর দারিদ্র্য নেই। কিন্তু দেখা যাচ্ছে দারিদ্র্য দিন দিন

ছড়িয়ে পড়ছে।

প্রধানমন্ত্রী বললেন, বাজে কথা। দেশে আর কোথাও দারিদ্র্য নেই।

—আছে। নইলে লেখকরা দারিদ্র্য নিয়ে এত লিখছে কেন?

—এসব তাদের বানানো গল্প।

—অসম্ভব। দেশে এখনো দারিদ্র্য আছে, এটা সত্য।

—তা আপনি কী করতে চান?

এর উত্তরে রাষ্ট্রপতি বেশ গম্ভীর গলায় বললেন, আপনাকে আমি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত করেছি। আমি চাই আপনি এর সমাধান করুন।

এইসময় একজন বলে উঠলেন, দারিদ্র্য দূর করার জন্যে একজন আমেরিকান এক্সপার্ট ডাকা হোক।

সঙ্গে সঙ্গে আর একজন তার প্রতিবাদ করে বললেন, আমেরিকান এক্সপার্ট! তারা এসে কী করবে! রাশিয়ানরা এ ব্যাপারে অনেক বেশি অভিজ্ঞ। আমরা চাই রাশিয়ান এক্সপার্ট। তারাই আমাদের দেশের দারিদ্র্য দূর করতে পারবে।

এ কথার পর গোটা সভা দুভাগে ভাগ হয়ে গেল। একদল আমেরিকান এক্সপার্ট আনার পক্ষপাতী। অন্যদল রাশিয়ান এক্সপার্ট আনার পক্ষপাতী। তারপর দুদলে যখন প্রায় হাতাহাতি হবার জোগাড় হল তখন রাষ্ট্রপতি সকলকে ধমক দিয়ে শান্ত করলেন। বললেন, এখন বিবাদের সময় নয়। এখন আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য দারিদ্র্য দূর করা। আপনারা ভাবুন কীভাবে তা করা যায়।

একজন এ-কথায় মাথা চুলকে বললেন, আমার মাথায় একটা উপায় এসেছে।

—কী উপায়?

—আমরা ইচ্ছে করলেই সারা দেশ থেকে গরীব মানুষদের মুছে ফেলতে পারি।

—কীভাবে?

—তেলে ভেজাল দিয়ে, ওষুধে ভেজাল দিয়ে।

আর একজন এ কথায় সায় দিয়ে বললেন, ঠিক। আমরা তেলে ভেজাল দিতে পারি, ওষুধে ভেজাল দিতে পারি। দরকার হলে বন্যা আনতে পারি, দুর্ভিক্ষ আনতে পারি।

অন্য একজন আর চুপ করে থাকতে পারলেন না। বললেন, এছাড়া আমরা মড়ক বাধাতে পারি, দাঙ্গা বাধাতে পারি।

প্রধানমন্ত্রীর মুখে এবার হাসি ফুটল। তিনি বললেন, চমৎকার! এটা আমার মাথায় আগেই আসা উচিত ছিল।

রাষ্ট্রপতি বললেন, এতে যদি কিছু না হয়?

প্রধানমন্ত্রী বললেন, আলবাত হবে।

১২

দেশের দরিদ্র মানুষদের নির্মূল করার জন্যে মন্ত্রীদের পরামর্শে একটি সংস্থা গঠন করা হল। তারা অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে তেলে ভেজাল দিল, ওষুধে ভেজাল দিল। দেশে বন্যা আনল, দুর্ভিক্ষ আনল। চারদিকে মড়ক বাধাল। দাঙ্গা বাধাল। লক্ষ লক্ষ লোক মারা গেল। রাস্তাঘাট মৃতদেহে ভরে গেল। তাদের পচা গন্ধে বাতাস ভারী হয়ে উঠল। কিন্তু লক্ষ লক্ষ দরিদ্র মানুষ তবুও বেঁচে রইল।

রাষ্ট্রপতি ক্রুদ্ধ হয়ে প্রধানমন্ত্রীকে বললেন, এটা কী হল?

প্রধানমন্ত্রী বললেন, তাইত দেখছি। দেশে যে এত গরীব আছে জানতাম না।

—এখন উপায়?

—বিদেশী এক্সপার্ট ডাকতেই হবে।

—তাই ডাকুন। আর আপনিও সেই সঙ্গে বিদায় নিন। আপনাকে আমি সাত বছর সময় দিয়েছি।

একথায় প্রধানমন্ত্রীর মুখ শুকিয়ে গেল। গলা দিয়ে আর স্বর বেরুল না। তাঁর মাথা ঝিম ঝিম করতে লাগল। বুঝতে পারলেন না এখন তিনি কী করবেন, কী বলবেন।

রাষ্ট্রপতি আবার বললেন, কী বলছি শুনতে পাচ্ছেন? এবার আপনি আসুন।

প্রধানমন্ত্রী এবার মরিয়া হয়ে উঠলেন। কোনোরকমে বললেন, আপনি আমাকে আর এক বছর সময় দিন।

—আরো এক বছর!

—প্লিজ!

রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর কথা শুনলেন। বললেন, ঠিক আছে। আর এক বছর সময় দিলাম। কিন্তু তার মধ্যে যদি...

—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নিজে নিশ্চিন্ত থাকতে পারলেন না। তাঁর খাওয়া কমে গেল, ঘুম কমে গেল, প্রেস কনফারেন্স কমে গেল, বক্তৃতা দেওয়া কমে গেল। তিনি কেবলই ভাবতে লাগলেন, আর মাত্র এক বছর। এর মধ্যে একটা কিছু তাঁকে করতেই হবে। কিন্তু কী করা যায়! তাঁর মাথায় কিছু এল না। তিনি শুধু ছটফট করতে লাগলেন।

এরই মধ্যে একদিন প্রীতি বলল, আমি চললাম।

—কোথায়!

—প্যারিসে।

—কেন ?

—এদেশে থাকা যায় না। থাকলে মরে যাব। আমার পাঁচ কেজি ওজন কমে গেছে।

—প্লিজ! আর কিছুদিন থাক। আমি শিগগির বিদেশ থেকে এক্সপার্ট আনাচ্ছি। আর ভয় নেই।

তবু প্রীতিকে আটকানো গেল না। প্রীতি প্লেনে চড়ে প্যারিসে চলে গেল। গিয়ে এক বিখ্যাত প্রকাশককে বিয়ে করে ঘর-সংসার করতে লাগল।

আর প্রধানমন্ত্রী প্রীতির বিরহ সহ্য করতে পারলেন না। একদিন তিনিও হার্ট অ্যাটাকে মারা গেলেন।

১৩

কিছুদিন পর রাষ্ট্রপতি আবার কাগজে বিজ্ঞাপন দিলেন : প্রধানমন্ত্রী পদের জন্যে দরখাস্ত আহ্বান করা হইতেছে। প্রার্থীকে অবশ্যই দারিদ্র্য দূরীকরণে পারদর্শী হইতে হইবে। প্রার্থীরা তাঁহাদের বয়স, শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার উল্লেখ করিয়া আবেদন করুন। বিদেশীরা অগ্রাধিকার পাইবেন। আবেদন করার শেষ তারিখ নয় আগস্ট, উনিশশো...।

এবারেও যথারীতি লক্ষ লক্ষ দরখাস্ত এল। তবে রাষ্ট্রপতি এবার বেছে বেছে পাঁচজনকে ডাকলেন। এঁদের মধ্যে একজন ছিল আমেরিকান, আর একজন রাশিয়ান। রাষ্ট্রপতি এই দুজনের কথাবার্তায় এত খুশি হলেন যে তিনি

দেশটাকে দু ভাগ করে এঁদের দুজনকে দুদেশের প্রধানমন্ত্রী করে দিলেন। দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে সুইজারল্যাণ্ডে গিয়ে বাস করতে লাগলেন।

তারপর?

তারপর দু দেশে আর দুঃখ-দারিদ্র্য রইল না। সবাই সুখে শান্তিতে বসবাস করতে লাগল।

হিপ হিপ হুররে!

১৯৮৮

কাকে চাই

ডোর-বেল টিপতেই একটা লোক দরজা খুলে দিল। আমি তাকে চিনি না। কোনদিন জীবনে দেখিনি। বিবির কেউ হবে হয়ত। কে? যাকগে, পরে জেনে নেব, এখন থাক। আমি ভিতরে ঢোকবার জন্যে পা বাড়ালাম। কিন্তু লোকটা আমায় ভিতরে ঢুকতে দিল না। হাত বাড়িয়ে আটকে দিল। জিজ্ঞেস করল, কাকে চাই?

আমি চমকে উঠলাম। আমার ফ্ল্যাট, আর আমাকেই জিজ্ঞেস করছে, কাকে চাই! আশ্চর্য! আমি লোকটার মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম। লোকটা কি বলছে! অবশ্য বলা স্বাভাবিক। কারণ, লোকটা আমাকে চেনে না। আমি কে, তা জানে না। জানলে নিশ্চয় এ প্রশ্ন করত না। তবু ব্যাপারটা ভালো লাগল না। বেশ খারাপই লাগল। লাগলেও আপাতত করার কিছু নেই। তাই সহজ গলায় জিজ্ঞেস করলাম, বিবি আছে?

—না।

—কোথায় গেছে?

—কি একটা কাজে বেরিয়েছে।

—কি কাজ?

—ঠিক জানি না।

—কোথায় গেছে?

—বলে যায়নি।

—কখন ফিরবে?

—ঠিক নেই।

আমি একটু থেমে এবার জিজ্ঞেস করলাম, আপনি বিবির কে হন?

—ঠিক স্বামী নই, তবে স্বামীর মতই।

—মানে?

—কিছুদিন হল আমরা একসঙ্গে আছি।

—স্বামী-স্ত্রীর মত?

—হ্যাঁ।

আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম। আমার মুখ দিয়ে কোন কথা বেরল না মাথার মধ্যে কেমন ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল। আমি কি শুনেছি? যা শুনেছি, ঠিক শুনেছি তো? না, কোন ভুল হয়নি। আমি ঠিকই শুনেছি। আস্তে আস্তে ভীষণ রেগে গেলাম। কিন্তু লোকটার গায়ে হাত দেওয়ার সাহস আমার হল না। তাই রাগ সামলে নিয়ে বললাম, কি বলছেন আপনি?

লোকটা ভুরু কুঁচকে বলল, আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না।

—না হবারই কথা।

—কেন?

—বিবির সঙ্গে আগে একজন থাকত।

—থাকতেই পারে। কি যায় আসে তাতে?

—আমিই সে ব্যক্তি। আর ঐ ফ্ল্যাট আমার। আপনি এক্ষুনি এখান থেকে চলে যান।

লোকটা এ-কথায় ভয়ঙ্কর উত্তেজিত হয়ে পড়ল। বলল, দেখুন, আপনি যেই হন, এই ফ্ল্যাট এখন আমার, বিবি এখন আমার। আমি কোনটাই ছাড়ব না। আপনি যা পারেন করুন।

আমি গলার স্বর তীক্ষ্ম করে জিজ্ঞেস করলাম, কি বলতে চান আপনি?

—আমি আপনাকে এই ফ্ল্যাটে ঢুকতে দেব না।

—এটা আমার ফ্ল্যাট। আর আপনি আমাকে ঢুকতে দেবেন না।

—না, দেব না।

—আপনার এত সাহস! কি নাম আপনার?

—বলাই দত্ত।

—আমি কিন্তু থানায় যাব।

—যান, এখনি যান।

—যাবই তো।

—যান। আমাকে বিরক্ত করবেন না।

তারপর লোকটা আর আমার সঙ্গে কথা বলার প্রয়োজন বোধ করল না। আমার মুখের ওপর আমারই ফ্ল্যাটের দরজা বন্ধ করে দিল। আমি শুধু তাকিয়ে দেখলাম, কিছু করতে পারলাম না। সারা শরীর চাপা রাগে রিরি করতে লাগল। রাগটা এখন যত না লোকটার ওপর, তার চেয়ে অনেক বেশি বিবির ওপর। অদ্ভুত মেয়ে বিবি! এই মেয়েকেই আমি ভালোবেসেছি।

আমার ফ্ল্যাটে এনে রেখেছি। সত্যি, লোকে ঠিক বলতো। তারা আমায় একসময় কত বুঝিয়েছে। বলেছে, বিবিকে বিশ্বাস করো না। ওকে নিয়ে একসঙ্গে থেকো না। আমি তাদের কথা শুনিনি। শুনলে আজ এই ঘটনা ঘটত না। কিন্তু এখন আমি কি করব? কার কাছে যাব? কে আমাকে এখন এই বিপদ থেকে বাঁচাবে?

ওপরের ফ্ল্যাটে বাড়িওয়ালা মিস্টার সেন থাকেন। তাঁকে এখনি ডেকে এই ঘটনাটার কথা বলতে পারি। কিন্তু ঘটনাটা জানাজানি হয়ে যাবে। তাঁর কাছ থেকে সারা ফ্ল্যাট-বাড়িতে এটা ছড়িয়ে পড়বে। পাড়ার লোকেরাও এটা আস্তে আস্তে জেনে যাবে। সবাই তখন সামনে সহানুভূতি দেখাবে। আড়ালে হাসি ঠাট্টা করবে। সে এক বিচ্ছিরি ব্যাপার! তাহলে এখন করব কি? থানায় যাব? থানায় গেলেও রেহাই নেই। ফ্ল্যাটে পুলিশ আসবে। তখন কি আর ঘটনাটা চাপা থাকবে? মুখে মুখে কথাটা ছড়িয়ে পড়বে। সুতরাং লোকটাকে তাড়াতে হলে কাজটা চুপিচুপি করা যাবে না। জানাজানি হবেই। অতএব মিস্টার সেনকেই প্রথমে ঘটনাটা বলি। দেখি, উনি কি পরামর্শ দেন।

ওপরে উঠে মিস্টার সেনের ফ্ল্যাটের ডোর-বেল টিপলাম। টিপতেই মিস্টার সেন দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন। একগাল হেসে জিজ্ঞেস করলেন, কি খবর?

বললাম, খুব বিপদে পড়ে গেছি।

—বিপদ! কি বিপদ? ভিতরে আসুন।

মিস্টার সেন আমাকে নিয়ে বসার ঘরে ঢুকলেন। আমি সোফায় বসলাম। তিনি আমার পাশে বসলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, কি ব্যাপার? কি হয়েছে আপনার?

—আমি কদিনের জন্য বাইরে গিয়েছিলাম।

—হ্যাঁ, তাই দেখিনি কদিন। তারপর?

—ফিরে এসে দেখছি...

আমি কথাটা শেষ করতে পারলাম না।

মিস্টার সেন বেশ কৌতূহলী হয়ে জানতে চাইলেন, কি দেখছেন?

—দেখছি আমার ঘর অন্য লোকে দখল করে নিয়েছে। আমাকে ঢুকতে দিচ্ছে না।

মিস্টার সেন রীতিমত চমকে উঠলেন, সে কি!

—হ্যাঁ, এখন কি করি বলুন তো?

—বিবি কোথায় ?

—কোথায় যেন কাজে বেরিয়েছে।

—কখন ফিরবে ?

—জানি না।

—লোকটা কি বলছে ?

—বলছে এ ফ্ল্যাট এখন তার, বিবিও তার। আমি এখন কেউ না।

—আপনি কিছু বলছেন না ?

—বললাম তো। কিন্তু লোকটা ভিতরে ঢুকতেই দিচ্ছে না।

—লোকটাকে দেখেছেন কোনদিন ?

—না।

—ওর নাম কি ?

—বলাই দত্ত।

—বলাই দত্ত! ও তো পার্টি করে, বাজে লোক। এ-কথায় আমি ভয় পেয়ে গেলাম। জিজ্ঞেস করলাম, তাহলে কি হবে ?

—বিবির জন্যে অপেক্ষা করুন। ও না এলে কিছু হবে না।

—কিন্তু ও যে কখন আসবে তার ঠিক নেই। আমি কতক্ষণ অপেক্ষা করব? আর অপেক্ষা করেই বা কি হবে ?

—একথা কেন বলছেন ?

—বলছি, কারণ বিবিই তো লোকটাকে ফ্ল্যাটে ঢুকিয়েছে। এখন বিবি যদি লোকটার মতই বলে...

—আপনি এত অধৈর্য হচ্ছেন কেন ?

—অধৈর্য হব না! কি বলছেন আপনি ?

—আপনি বড় উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন। মাথা ঠাণ্ডা করুন। এক কাপ চা খান।

—না, আমি এখন চা খাব না। আমি এখন কিছু করতে চাই। আপনি আমাকে সাহায্য করুন।

—কি সাহায্য করব ?

—আপনি লোকটাকে গিয়ে ফ্ল্যাট ছেড়ে দিতে বলুন।

—আমি কি করে বলব ? ফ্ল্যাটে থাকেন আপনি। কথাটা আপনি বলতে পারেন, আমি পারি না।

—আপনি তো বাড়িওয়ালা।

—তাতে কি। বলাই দত্ত আমার কথা শুনবে কেন?

—তাহলে?

—তাহলে থানায় যান।

আমি আর বাক্য ব্যয় না করে উঠে দাঁড়ালাম। মিস্টার সেন দরজা খুলে দিলেন। আমি বেরিয়ে এলাম। তিনি তখন বললেন, আপনার জন্যে এই মুহূর্তে কিছু করতে পারলাম না বলে দুঃখিত। আপনি আমাকে ভুল বুঝবেন না। আপনি দরকার হলে আবার আসবেন। আমার কিছু করার থাকলে, ঠিক করব।

—ধন্যবাদ।

আমি ওপর থেকে নিচে নেমে এলাম। নিজের ফ্ল্যাটের সামনে দাঁড়িয়ে এখন কি করব তা ভাবতে লাগলাম। ভাবতে লাগলাম বিবির জন্যে অপেক্ষা করব, না থানায় যাব? ভাবতে ভাবতে ঠিক করলাম অপেক্ষা করে লাভ নেই। এখুনি থানায় যাই। দেখি, থানা থেকে কোন সাহায্য পাই কি না। যদি পাই তো খুব ভালো, নইলে অন্য পথ ধরতে হবে। তবে থানায় যাবার আগে একবার দেখে যাই বিবি এখনো ফিরেছে কিনা। ফিরলে বিবির কাছ থেকেই সব জানতে পারব। কিন্তু বিবি এটা কি করল? আমার অনুপস্থিতিতে আর একটা লোককে নিয়ে ঘর করতে শুরু করল? আমাকে একবার বলার প্রয়োজন মনে করল না। বিবি আমার বিয়ে করা বউ না। আমরা ভালোবেসে একসঙ্গে আছি। এখন ও যদি অন্য কাউকে ভালোবাসতে চায়, ভালোবাসুক। আমার খারাপ লাগলেও বাধা দেব না। তবে আমার ফ্ল্যাটে থেকে এসব করতে দেব না। অন্য ফ্ল্যাট ভাড়া করে যা খুশি করুক। আমি তা দেখতেও যাব না, বাধাও দেব না। তবে আমার কাছে যে-কদিন থাকবে, আমাকেই ভালোবাসতে হবে, অন্য কাউকে ভালোবাসা চলবে না। বিবি কাজটা মোটেই ভালো করেনি। খুব অন্যায় করেছে। বিবির ওপর আমার প্রচণ্ড রাগ হল।

আমি ডোর-বেল টিপলাম। আবার বলাই দত্ত দরজা খুলে দাঁড়াল। আমাকে দেখেই দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বলল, কি চাই আপনার? আবার এসেছেন কেন?

কথাটা শুনেই মেজাজ আরো গরম হয়ে গেল। আমার ফ্ল্যাট, আর

আমাকেই জিজ্ঞেস করছে, কি চাই আপনার ? আবার এসেছেন কেন ? ইচ্ছে হল, এখনি ঘুষি মেরে বলাই দত্তর নাক ফাটিয়ে দিই। কিন্তু এখন উত্তেজিত হলে চলবে না। মাথা ঠাণ্ডা রেখে কথা বলতে হবে, সব কাজ করতে হবে। তাই শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করলাম, বিবি ফিরেছে ?

উত্তরে বলাই দত্ত বলল, বিবি এখন আমার। সে ফিরেছে কি ফেরেনি, তা দিয়ে আপনার কি হবে ?

এবার নিজেকে শান্ত রাখতে পারলাম না। উত্তেজিত হয়ে পড়লাম। বললাম, খবরদার ! বাজে কথা বলবেন না।

বলাই দত্তও খুব রেগে গেল। বলল, মেজাজ দেখাবেন না। আমি যা বলেছি, ঠিক বলেছি। একটুও বাজে কথা বলিনি।

—বলেছেন, একশবার বলেছেন। বিবি আমার, আপনার নয়।

—হ্যাঁ, আমার। বিবি আমার, বিবি আমার, বিবি আমার।

—না, আপনার নয়।

—হ্যাঁ, আমার।

—গায়ের জোর দেখাচ্ছেন ?

—হ্যাঁ। গায়ের জোর দেখাচ্ছি।

—আপনি তো অদ্ভুত লোক মশাই।

—অদ্ভুত কেন ?

—আমার বিবি, আর আপনি তাকে গায়ের জোরে নিয়ে নেবেন ?

—নেব।

এ কথার পরে আর কি বলব ? অসহায় হয়ে বললাম, ঠিক আছে, নিয়ে নিন বিবিকে। আপনি এখন আমার ফ্ল্যাট ছেড়ে দিন।

—আপনার ফ্ল্যাট ?

—হ্যাঁ, আমার ফ্ল্যাট।

—না। এখন আমি এ ফ্ল্যাটে থাকি। এ ফ্ল্যাট এখন আমার।

—বললেই হবে আমার। গায়ের জোর ?

—হ্যাঁ, গায়ের জোর। এ ফ্ল্যাট আমি ছাড়ব না।

—ছাড়তে হবে।

—অসম্ভব। আমি ছাড়ব না। আপনি কোর্টে যেতে পারেন।

—আমি কোর্টে যাব কেন ?

—তাহলে থানায় যান। আমাকে আর জ্বালাতন করবেন না।

এই বলে বলাই দত্ত আমার মুখের ওপর শব্দ করে আমার ফ্ল্যাটের দরজা বন্ধ করে দিল। আমি অপমানিত হয়ে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপর ঠিক করলাম, বিবির জন্যে অপেক্ষা করব না। আমি এখনি থানায় যাব। এখনি এর একটা হেস্তনেস্ত হওয়া দরকার।

থানা এখান থেকে আধ ঘণ্টার পথ। ট্যাক্সি করে গেলে হয়। কিন্তু রাস্তায় পা দিয়ে একটা ট্যাক্সিও চোখে পড়ল না। আমি হাঁটতে লাগলাম। হাঁটতে হাঁটতে আমি কেবল বিবির কথাই ভাবতে লাগলাম। সত্যি, মেয়েদের বাইরে থেকে দেখে কিছু বোঝার উপায় নেই। বিবি আমার সঙ্গে যে এরকম করবে, তা কোনদিন ভাবতে পারিনি। তার কথাবার্তায় কিছু ধরতে পারিনি, কোন সন্দেহ জাগেনি। কেবল-ই মনে হয়েছে, বিবি আমাকে ভীষণ ভালো-বাসে। আমার জন্যে সে সব করতে পারে, আমিও বিবিকে একটু আগে পর্যন্ত ভীষণ ভালোবাসতাম। বিবির জন্যে সব করতে পারতাম। তাই আমরা কোনদিন বিয়ের মধ্যে জড়াইনি। ভেবেছি বিয়ে একটা জবরদস্তি। আমরা ঠিক করেছিলাম, সবাই বিয়ে করে, আমরা করব না। বিয়ে না করেই আমরা সারাজীবন স্বামী-স্ত্রীর মত একসঙ্গে থাকব। আর বনিবনা না হলে আমরা আলাদা হয়ে যাব। অশান্তি করে একসঙ্গে বাস করব না। কিন্তু একি! আমরা একসঙ্গে একবছর-ও থাকতে পারলাম না! বিবি এই বিচ্ছিরি কাণ্ডটা ঘটিয়ে বসল! এখন দেখছি আমাদের বিয়ে না হয়ে কত ভালো হয়েছে। বিয়ে হলে বিবি তো যা করার করত। আর আমি মানসিক অশান্তিতে ভুগতাম, ডিভোর্সের জন্যে ছুটোছুটি করতাম। এখন সেসব ঝামেলা নেই। বিবি আমার কেউ না। বিবিকে এখন-ই ঝেড়ে ফেলতে পারি। আমার কোন দায়িত্ব থাকবে না। ও এখন যেখানে খুশি যাক, যার কাছে খুশি যাক। আমি-ও আবার একজনকে ভালোবাসতে পারি, তাকে ঘরে এনে রাখতে পারি। আবার তাকে ভালো না লাগলে ছেড়ে দিতে পারি। আবার আর একজনকে ঘরে আনতে পারি। কারো কিছু বলার থাকবে না। কিন্তু বিবি আমার সঙ্গে বড় তাড়াতাড়ি বিশ্বাসঘাতকতা করল! যাকগে, যা হবার হয়ে গেছে। এ নিয়ে আর মন খারাপ করে লাভ নেই। বিবি গেছে, যাক। ফ্ল্যাটটা না গেলেই বাঁচি। ফ্ল্যাটটা যেন বিবির মত হাতছাড়া না হয়ে যায়। যেন আমার ফ্ল্যাট আবার আমার কাছেই ফিরে আসে। এর জন্যে যা করার করতে হবে।

এখন দেখি থানার ও সি আমাকে কতখানি সাহায্য করেন। বলাই দত্ত পার্টি করে। অতএব ও সির বলাই দত্তর নাম অজানা থাকার কথা নয়। এখন উনি যেন আবার বলাই দত্তর নাম শুনে পিছিয়ে না যান। পুলিশেরা আবার পার্টির লোকজনদের খাতির করে চলে। কারণ, কে কখন ক্ষমতায় আসে বলা যায় না।

থানা এসে গেল। ভিতরে ঢুকলাম। কপাল ভালো। ও সি তাঁর ঘরেই বসেছিলেন। আমি একজন পুলিশের অনুমতি নিয়ে তাঁর ঘরে ঢুকলাম। তিনি আমার দিকে তাকালেন। আমি তাঁকে বললাম, আমি ভীষণ বিপদে পড়েছি।

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আমার ওপর বোধহয় তাঁর সহানুভূতি হল। বললেন, বসুন আপনি।

আমি তাঁর সামনের একটা চেয়ারে বসলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, বলুন, কি ব্যাপার?

আবার বললাম, আমি ভীষণ বিপদে পড়ে গেছি।

—সে তো বুঝলাম, কিন্তু বিপদটা কি?

—বলাই দত্তকে চেনেন?

—চিনি।

—কেমন লোক?

—পার্টি করে, ধান্দাবাজ। তা, বলাই দত্ত আপনার কি করল?

—আমার অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে আমার ফ্ল্যাট দখল করে নিয়েছে।

—সে কি! ফ্ল্যাটে আর কেউ ছিল না?

—ছিল।

—বিবি ছিল। বিবি মানে···মানে...

—আপনার স্ত্রী?

—ঠিক স্ত্রী নয়। তবে আমরা স্বামী-স্ত্রীর মতই একসঙ্গে থাকি।

—ভেরি ইন্টারেস্টিং। আমারো এরকম থাকতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু কিছু করার নেই।

—কেন?

—বিয়ে করে ফেলেছি। ছেলেমেয়ে হয়ে গেছে। যাকগে, তা আপনার বিবি, বলাই দত্তকে ঢুকতে দিল কেন?

আমি এর কি উত্তর দেব ? চুপ করে রইলাম। ও সি তা লক্ষ্য করে বললেন, বুঝতে পেরেছি। আপনার অনুপস্থিতিতে আপনার বিবির সঙ্গে বলাই দত্তর ভাব-ভালোবাসা হয়েছে। তাই বলাই দত্ত আপনার অনুমতি না নিয়ে আপনার ফ্ল্যাটে থাকতে শুরু করেছে। তাইতো ?

বললাম, হ্যাঁ।

—আপনার নাম কি ?

বললাম।

—ফ্ল্যাটের ঠিকানা ?

বললাম।

—আপনি কি করেন ?

—বললাম।

ও সি সব শুনে বললেন, আমার এক্ষেত্রে কিছু করার নেই।

আমি একথায় ভেঙে পড়লাম। বললাম, আমি তাহলে এখন কি করব ?

—পথে পথে ঘুরে বেড়ান।

—সে কি করে সম্ভব।

—তা আমি কি করব ?

—আপনি আমাকে আমার ফ্ল্যাটে ঢুকিয়ে দিন।

—জোর করে ঢুকে যান।

—আমার সে জোর নেই।

—পাড়ার ছেলেদের বলুন।

—তাদের সঙ্গে আমার পরিচয় নেই।

—পার্টি করেন ?

—না।

—আপনি একেবারেই অপদার্থ। বলাই দত্তকে ভালোবেসে আপনার বিবি দেখছি কোন ভুল করেনি। সে ঠিক কাজই করেছে।

একথায় ভীষণ অপমানিত বোধ করলাম। কিন্তু কিছু করার নেই। সব অপমান মুখ বুজে হজম করলাম। বলাই দত্তর কথা সহ্য করেছি, ও সির কথাও সহ্য করলাম। কারণ ও সিকে চটালে চলবে না। ও সির অনুগ্রহ আমার চাই। তাই ও সিকে খুশি করার জন্যে বললাম, আপনি ঠিকই বলেছেন। আমি একেবারেই অপদার্থ। নইলে এরকম ঘটনা ঘটবে

কেন? কিন্তু ফ্ল্যাটটা তো আমার। আপনি বলাই দত্তকে ফ্ল্যাটটা ছেড়ে দিতে বলুন। আপনি ছাড়া...

—আপনি ভাড়াটে?

—হ্যাঁ।

—ভাড়ার বিল আপনার নামে কাটা হয়?

—হ্যাঁ।

—বাড়িওয়ালা ওখানেই থাকে?

—হ্যাঁ।

—বাড়িওয়ালা বলবে আপনি ওর ভাড়াটে?

—নিশ্চয় বলবে।

—বললে ভাল...আচ্ছা দেখি কি করা যায়।

এই বলে ও সি বেল টিপে বেয়ারাকে ডাকলেন। বেয়ারা সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঢুকল। তিনি তাকে দাশবাবুকে ডেকে আনতে বললেন। বেয়ারা চলে গেল। একটু পরে সাদা ইউনিফর্ম পরা পুলিশ ঢুকল। মনে হল ইনিই দাশ-বাবু। ও সি তাঁকে বললেন, আপনি এঁর সঙ্গে যান তো। সঙ্গে দুজন কনস্টেবল নিয়ে যান। বলাই-এঁর ফ্ল্যাট দখল করে নিয়েছে। এঁকে ঘরে ঢুকতে দিচ্ছে না। আপনি এঁকে ঘরে ঢুকিয়ে দিন।

দাশবাবু জানতে চাইলেন, বলাইকে বের করে দেব?

—নিশ্চয়।

—ঝামেলা করবে না-তো?

—করলে থানায় ধরে নিয়ে আসবেন।

ও সি তারপর আমাকে বললেন, আপনি যান ওর সঙ্গে। আমি তখন ও সিকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিয়ে চলে এলাম।

থানার বাইরে একটা জিপ দাঁড়িয়ে ছিল। আমরা সবাই জিপে গিয়ে উঠলাম। আমি ড্রাইভারকে কোথায় যেতে হবে তা বলে দিলাম। জিপ চলতে শুরু করল।

দাশবাবু জিজ্ঞেস করলেন, ব্যাপারটা কি?

আমি তাঁকে কিছু গোপন না করে সব কথাই খুলে বললাম। তিনি সব শুনে বললেন, আপনার বিবি তো সাংঘাতিক মেয়ে।

—তাই তো দেখছি।

—খুব সমস্যার ব্যাপার।

—কেন?

—আমি না হয় আপনাকে ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে এলাম, তারপর? আপনার বিবি যদি বলাই দত্তকে আবার ঘরে আনে? কিংবা অন্য কাউকে? আমরা তো বারবার আসব না। আপনি কি আপনার বিবির সঙ্গে এ'টে উঠতে পারবেন?

—পারব না কেন? ফ্ল্যাটটা তো আমার।

—এখনো তো আপনার। তবু বলাই দত্ত ঢুকল কি করে? কিছু মনে করবেন না, আজ বলাই দত্ত চলে গেল, কাল তো আবার আসবে। আপনি তখন কি করবেন? তাকে আটকাতে পারবেন? আপনার সে ক্ষমতা আছে? আপনার ওজন কত?

—পঞ্চাশ কেজি।

—তাহলে? এই ওজন নিয়ে কেউ বলাই দত্তর সঙ্গে লড়তে যায়।

—আপনি কি করতে বলেন?

—বন্ধু হিসেবে একটা পরামর্শ দেব?

—দিন।

দাশবাবু আমার কানে মুখ এনে বললেন, আপনার বিবিকে এই মুহূর্তে পরিত্যাগ করুন। নইলে জীবনে কোনদিন শান্তি পাবেন না।

তারপর দাশবাবু কান থেকে মুখটা সরিয়ে এনে বললেন, ভুল বললাম?

—মোটেই না। আপনি ঠিক বলেছেন।

আমার এই কথা শুনে দাশবাবু নিজের মনে বিড়বিড় করে বললেন, আমাকেও তাই করতে হবে। আর পারছি না।

আমি চমকে উঠে জিজ্ঞেস করলাম, মানে?

—আমার-ও প্রায় আপনার মতই অবস্থা।

—আপনি পুলিশ। আপনাকে মানছে না!

দাশবাবু ঠোঁট উল্টে বললেন, না।

এইসময় জিপ আমাদের ফ্ল্যাট-বাড়ির সামনে চলে এল। আমি জিপ দাঁড় করলাম। দাশবাবু, আমি এবং দুজন কনস্টেবল জিপ থেকে নামলাম। নেমে বাড়ির ভিতরে ঢুকলাম। সি'ড়ি ভেঙে ওপরে উঠলাম। নিজের ফ্ল্যাটের সামনে এসে দাঁড়ালাম। ডোর-বেল টিপলাম। বলাই দত্ত দরজা খুলে

বেরিয়ে এল। এসেই আমাদের দেখে একটু হকচকিয়ে গেল। কি বলবে যেন বুঝে পেল না। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে আমাকে লক্ষ্য করে বলল, পুলিশ আপনার খুব বাধ্য দেখছি। ডাকতেই চলে এল। অথচ আমরা ডাকলে আসে না। কি ব্যাপার ?

দাশবাবু ধমক দিয়ে বললেন, বাজে কথা ছাড়ুন। ওনার ফ্ল্যাট ছেড়ে দিন।

—ফ্ল্যাট তো ওনার নয়।

—কার ?

—যে থাকে তার।

আমি সঙ্গে সঙ্গে বললাম, এ ফ্ল্যাটে আমি থাকি, এ ফ্ল্যাটে আমার।

বলাই দত্ত বলল, প্রমাণ ?

আমি উত্তেজিত হয়ে বললাম, প্রমাণ চাই ?

—হ্যাঁ।

আমার পাশে এখন পুলিশ আছে। আমি বলাই দত্তকে ভয় করলাম না। তাকে সরিয়ে ঘরে ঢুকলাম। আলমারি খুলে ভাড়ার পুরনো রসিদ বের করলাম। করে দাশবাবুকে দেখালাম। বললাম, দেখুন কার নাম লেখা আছে।

রসিদটা ভালো করে দাশবাবু দেখলেন। তারপর বলাই দত্ত দেখল। দেখে আমাকে জিজ্ঞেস করল, এখন আপনিই যে এই ব্যক্তি তার প্রমাণ চাই।

—আবার প্রমাণ চাই ?

—হ্যাঁ।

আমি সঙ্গে সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম। দ্রুত সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠলাম। মিস্টার সেনকে ডাকলাম। মিস্টার সেন বেরিয়ে এলেন। আমি তাঁকে বললাম, আপনি একটু আসুন।

—কোথায় ?

—নিচে।

—কেন ?

—দরকার আছে।

—কিন্তু...

—কোন কিন্তু নয়। আপনি দয়া করে একটুখানি আসুন।

মিস্টার সেন আর আমার কথা ফেলতে পারলেন না। নিচে এলেন। কিন্তু পুলিশ দেখে একটু যেন ঘাবড়ে গেলেন। জিজ্ঞেস করলেন, কি ব্যাপার?

দাশবাবু মিস্টার সেনকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি এ বাড়ির কে?

মিস্টার সেন বললেন, বাড়িওয়ালা।

দাশবাবু তখন আমাকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি এনাকে চেনেন?

—চিনি।

—কি নাম এ'র?

মিস্টার সেন আমার নাম বললেন।

দাশবাবু এবার জিজ্ঞেস করলেন, আপনার সঙ্গে এ'র সম্পর্ক?

—ইনি আমার ভাড়াটে।

—এই ফ্ল্যাটে থাকেন?

—হ্যাঁ।

দাশবাবু এবার বলাই দত্তকে হুকুম করলেন, আর একমুহূর্ত দেরি করবেন না। আপনি এক্ষুনি আপনার জিনিসপত্তর নিয়ে বেরিয়ে যান।

বলাই দত্ত বলল, কিন্তু আমার বিবি না আসা পর্যন্ত কি করে যাই!

—আপনার বিবি?

—হ্যাঁ। আগে এনার ছিল, এখন আমার।

—ঠিক আছে, বিবি এলে আপনার কাছে পাঠিয়ে দেব।

—আপনি এখন এনার ঘর ছেড়ে দিন।

বলাই দত্ত একটু ইতস্তত করছিল। দাশবাবু ধমক দিয়ে বললেন, কি হল? দেরি করছেন কেন? যান, এক্ষুনি বেরিয়ে যান।

বলাই দত্ত আর দেরি করতে সাহস করল না। একটা সুটকেসে জামা-কাপড় গুছিয়ে নিয়ে বেরিয়ে গেল। তবে যাবার আগে আমাকে শাসিয়ে গেল, এর ফল কিন্তু ভালো হবে না।

আমি একথার উত্তর দিলাম না। দেবার প্রয়োজন বোধ করলাম না।

মিস্টার সেন এইসময় দাশবাবুকে বললেন, আমি তাহলে আসি?

দাশবাবু বললেন, আসুন।

—দেখবেন মশাই, আমি যেন কোন বিপদে না পড়ি।

—কোন ভয় নেই আপনার।

—ধন্যবাদ।

মিস্টার সেন চলে গেলেন।

দাশবাবু এবার বললেন, আমিও আসি তাহলে ?

—আসুন। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

ধন্যবাদের কি আছো। এত আমাদের কাজ।—বলে একটু থেমে দাশবাবু বললেন, তবে একটা কথা…

—কি ?

—আপনার বিবিকে…

—আর ও আমার নয়।

—যাই হোক, আর ওনাকে এখানে রাখা ঠিক হবে না। অবশ্য এসব বলা আমার উচিত নয়।

—উচিত নয় কেন ? আপনি ঠিকই বলেছেন। আমি আর বিবিকে এখানে রাখব না।

—ঠিক আছে। আসি তাহলে ?

—আসুন।

দাশবাবু দুজন কনস্টেবলকে সঙ্গে নিয়ে চলে গেলেন। আমিও ঘরের দরজা বন্ধ করে দিলাম। দিয়ে বসার ঘরে ঢুকলাম, শোবার ঘরে ঢুকলাম, রান্নাঘরে ঢুকলাম। সব ঘরগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলাম। না, কোন পরিবর্তন হয়নি। যেখানে যা ছিল, সেখানে তাই আছে। আমি তাহলে এখন নিশ্চিন্ত। না, এখনও আমি নিশ্চিন্ত নই। বলাই দত্তকে তাড়িয়েছি, এবার বিবির পালা। বিবিকে বের করে দিতে পারলে আমি পুরোপুরি নিশ্চিন্ত। কিন্তু বিবি যদি না যেতে চায় ? যদি ঝামেলা পাকায় ? কিংবা হয়ত কিছুই করল না। না করে কাঁদতে শুরু করল। আমার কাছে ক্ষমা চাইতে লাগল। আমি তখন কি করব ? আমি কি বিবিকে নিয়ে আবার ঘর করব ? অসম্ভব। এমন মেয়েকে নিয়ে কখনোই ঘর করা যায় না।

এমন সময় ডোর-বেলের শব্দ। কে এল ? বিবিই এল বোধহয়। আমি দরজা খুলে দিলাম। আমার অনুমান ঠিক। বিবিই দাঁড়িয়ে আছে। তার চোখ মুখ যেন রাগে ফেটে পড়ছে।

বিবি ঘরে ঢুকল। আমি দরজা বন্ধ করে দিলাম। বিবি বলল, তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।

আমিও বললাম, আমারও কিছু কথা আছে।

তারপর আমরা বসার ঘরে ঢুকে মুখোমুখি বসলাম।

বিবি জিজ্ঞেস করল, তোমার কি বলার আছে?

—বলছি। আগে তোমারটা শুনি।

—তুমি বলাইকে পুলিশ ডেকে বের করে দিয়েছ?

—কে বললে?

—বলাই।

—বলাইয়ের সঙ্গে কোথায় দেখা হল?

—রাস্তায়।

—রাস্তায় ও কি করছিল?

—আমার জন্যে অপেক্ষা করছিল। ও আমাকে সব বলল। তুমি খুব অন্যায় কাজ করেছ।

—অন্যায়! আমি কোন অন্যায় করিনি। আমি ঠিক করেছি।

—ঠিক করেছ!

—হ্যাঁ, ঠিক করেছি।

—বলাই এখন আমার কে জান?

—কে?

—এখন বলাই আমার সব। এখন বলাই আমার স্বপ্ন। এখন আমি ওকে ভালোবাসি।

—খুব ভাল কথা। কিন্তু আমার ফ্ল্যাটে ওকে ঢুকিয়েছ কেন?

—তাই বলে ওকে এভাবে অপমান করে তাড়িবে দেবে?

—আমি ওকে প্রথমে অপমান করিনি। ওই প্রথম আমাকে অপমান করেছে, আমাকে ঘরে ঢুকতে দেয়নি।

—সে তোমাকে চেনে না বলে। ওর মত মানুষ হয় না।

—যাকগে, এনিয়ে আমি কোনো কথা বলতে চাই না। তোমার এছাড়া আর কোন কথা আছে?

বিবি এ প্রশ্নের উত্তরে গুম হয়ে বসে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, আমি আর তোমার সঙ্গে থাকতে চাই না।

—আমিও চাই না।

—আমি এখনি চলে যাব।

—স্বচ্ছন্দে।

—আমি আজ থেকে বলাইয়ের সঙ্গে থাকব।

—তোমার খুশি।

—আমি তোমার মুখ আর দেখতে চাই না

—আমিও তোমার মুখ আর দেখতে চাই না।

—তুমি বড় বেঁটে।

—তুমি বড় ঢ্যাঙা।

একথায় বিবি যেন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল, কি বললে? আমি ঢ্যাঙা? ঠিক আছে, আমি এ ফ্ল্যাট ছেড়ে কোথাও যায় না। এখানেই থাকব। দেখি তুমি কি করতে পার?

আমি বিপদ দেখে সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমা চেয়ে বললাম, আমার অন্যায় হয়েছে। তুমি কিছু মনে করো না। আর, তুমি তো সত্যি সত্যি ঢ্যাঙা নও। তোমার এতে রাগের কি আছে?

বিবি এবার একটু শান্ত হয়ে বলল, আর কোনদিন একথা বলবে না তো?

—আর কি করে বলব! আমাদের তো আর দেখাই হবে না।

—কেন হবে না! বলাইকে যদি ভাল না লাগে? যদি আবার ফিরে আসি?

আমি আতঙ্কিত হলাম, আবার ফিরে আসবে!

—আসতেও তো পারি।

আমি একথা শুনে তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গ বদলানোর জন্যে জিজ্ঞেস করলাম, বলাই কি এখনো রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে?

—আমি ওকে ট্যাক্সি ডাকতে বলেছি। ট্যাক্সি পেলে ও হর্ন বাজাবে।

এইসময় হর্ন বাজানোর শব্দ হল।

আমি বললাম, ট্যাক্সি এসে গেছে।

—তাহলে চলি। আর দেরি করা উচিত নয়।

—হ্যাঁ, তাড়াতাড়ি কর। তোমাদের কপাল ভালো।

—কেন?

—ট্যাক্সি পেয়েছ।

উত্তরে বিবি একটু হাসল। তারপর নিজের জিনিসপত্তর গুছিয়ে নিল। আমি দরজা খুলে দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কি বলাইকে বিয়ে করবে?

বিবি কপালে ভুরু তুলে বলল, বিয়ে! পাগল! বিয়ে আমি তোমাকে

করিনি, বলাইকেও করব না। বিয়ের নাম শুনলে আমার আতঙ্ক হয়।

—কেন ?

—বিয়ে করা মানেই রান্না করা, কাপড় কাচা, ছেলেমেয়ে মানুষ করা। বিয়ে আমি জীবনে কাউকে করব না।

—সারা জীবন এভাবেই কাটাবে ?

নিশ্চয়। —বলেই বিবি খোলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল।

আমি নিশ্চিন্ত হয়ে ফ্ল্যাটের দরজা বন্ধ করে ছিলাম। আর আমার ভাবনা নেই। আমার ফ্ল্যাট আবার আমার হল। মাঝখান থেকে একটু ঝামেলাটা পোহাতে হল। ঝামেলাটা বিবির জন্যেই হল। এখন বিবি নেই, আর ঝামেলাও হবে না। বিবিকে নিয়ে প্রায় এক বছর ছিলাম। ওকে বিশ্বাসও করতাম। কিন্তু ও যে লুকিয়ে লুকিয়ে বলাই দত্তকে ভালোবাসতে শুরু করেছিল, তা জানতে পারিনি। কোনদিন টেরও পাইনি। আজ প্রথম জানতে পারলাম। বলাই দত্তর কাছ থেকেই জানতে পারলাম। যাক, থানার ও সিকে ধন্যবাদ। তাঁর জন্যেই বলাই দত্তকে এখান থেকে সরাতে পারলাম। নইলে আমার পক্ষে এখানে ঢোকা কোনদিনই সম্ভব হত না। অন্য ফ্ল্যাট ভাড়া করে চলে যেতে হত। এখনি অবশ্য ফ্ল্যাট পেতাম না। হোটেলে গিয়ে উঠতে হত। তারপর ফ্ল্যাট পেলে হোটেল ছেড়ে দিতাম। আর ততদিন এক অশান্তির মধ্যে আমাকে থাকতে হত।

তবে ফ্ল্যাট খালি রাখা ঠিক নয়। বিবি চলে গেছে। এখন বিবির বদলে আর একজনকে এখানে এনে রাখা দরকার। নইলে আবার একটা অঘটন ঘটে যেতে পারে। কারণ অফিসের কাজে মাঝে মাঝে এখানে সেখানে যেতে হয়। দুচার দিন বাইরে থাকতে হয়। কখনো কখনো দশ পনের দিনও থাকতে হয়। কোন ঠিক নেই। আর এই কদিন কেউ ফ্ল্যাটে না থাকলে ফ্ল্যাটে তালা দিয়ে যেতে হবে। সে-তালা ভাঙা কঠিন নয়। যে-কেউ সে-তালা, ভেঙে ঘরে ঢুকতে পারে। বসবাস আরম্ভ করে দিতে পারে। আমি এসে আজকের মতই দেখব আমার ফ্ল্যাট আর আমার নেই। থানার ও সি একবার আমায় বাঁচিয়েছেন। দ্বিতীয়বার নিশ্চয় বাঁচাবেন না।

সুতরাং একজন বিশ্বস্ত লোক চাই। কোন আত্মীয়স্বজনকে ঢোকাব না। তাদের ঢোকালে আর বের করতে পারব না। বের করতে গেলে অশান্তি হবে। বিয়ে করাই ভাল। কিন্তু বিয়ে করাও খুব ঝুঁকি। কেমন বউ হবে,

তা আগে থাকতে বোঝা যাবে না। বোঝা যাবে বিয়ের পরে। তখন বুঝেও কোন লাভ নেই। ডিভোর্স না হওয়া পর্যন্ত ঘোর অশান্তির মধ্যে থাকতে হবে। আর ডিভোর্সের পরেও রেহাই নেই। আজীবন খোরপোষ দিয়ে যেতে হবে। না, বিয়ের ঝামেলার মধ্যে যাব না। তার চেয়ে বিবির মত কাউকে নিয়ে থাকব। যদি সে আমার সঙ্গে সারাজীবন থাকতে পারে তো ভালো, নইলে যখন মন হবে, চলে যাবে। আমার কোন আফসোস থাকবে না। তবে বিবির মত কেউ যেন বিশ্বাসঘাতকতা না করে। আমার কাছে থাকবে, অথচ ভালোবাসবে আর একজনকে, এটা যেন না ঘটে। কিন্তু বিশ্বাসী ভাল মেয়ে এখনি কোথায় পাই? অথচ আমার এখনি দরকার। দেরি করলে চলবে না। কদিন পরেই আবার অফিসের কাজে বাইরে যেতে হবে। তার আগেই কাউকে ঘরে ঢুকিয়ে যাব। কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দিলে ভালো হত। দেখেশুনে মেয়েও আনা যেত। এর জন্যে সময় দরকার। আমার হাতে সে সময় নেই। বেশ চিন্তায় পড়ে গেলাম। কি যে করি।

ঠিক এইসময় ডোর-বেল বেজে উঠল। দরজা খুলে দেখি ঝুমা। ঝুমা সামনের ফ্ল্যাট-বাড়িতে থাকে। মাঝে মাঝে বিবির কাছে আসত, গল্প করত। মেয়েটি খারাপ নয়। ওকে ইচ্ছে করলে ভালোবাসাও যায়। আমি অবশ্য ওকে কোনদিন ভালবাসার কথা ভাবিনি। তবে এখন ওকে দেখে ভালোবাসতে ইচ্ছে করল।

ঝুমা বলল, বিবি চলে গেল?

বললাম, হ্যাঁ, কিন্তু তুমি জানলে কি করে?

—ও মা! সবাই জানল, আর আমি জানব না?

—সবাই মানে?

—পাড়ার সবাই। তা তুমি কি এখন একা একা থাকবে?

—একা থাকার ইচ্ছে নেই।

—কারোর কথা ভেবেছ?

—না।

—তাহলে আমি তোমার সঙ্গে থাকতে পারি।

—খুব ভাল কথা। কিন্তু একটা শর্ত।

—কি?

—আমি কিন্তু তোমাকে কোনদিন বিয়ে করব না।

—সে হবে না। বিয়ে তোমাকে করতেই হবে। বিয়ে ছাড়া আমি কারো ঘর করতে পারব না।

—তাহলে এ নিয়ে কথা বলে লাভ নেই। বিয়ে আমি কাউকে করব না।

—কেন?

—মাথা খারাপ! ঐ ঝামেলার মধ্যে কেউ জড়ায়!

—কিসের ঝামেলা?

—থাক এসব কথা। বরঞ্চ তোমার যদি জানাশুনো কোন ভালো মেয়ে থাকে তো বল। আছে এমন কেউ?

—আছে, অনেক আছে।

—বিয়ে না করে আমার সঙ্গে থাকবে?

—থাকবে।

—তাহলে এখনি দু-তিনজনকে পাঠিয়ে দাও।

—চাকুরিরতা চাই?

—না।

—ঠিক আছে। এখনি পাঠিয়ে দিচ্ছি। তুমি বাড়ি আছ তো?

—আছি। তবে মেয়ে যেন বিশ্বাসী হয়, দেখতে শুনতে ভালো হয়।

—সেসব জানি না। আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি। তুমি কথা বলে দেখ।

ঝুমা এই বলে চলে গেল। আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম। প্রতি মুহূর্তে ভাবতে লাগলাম এই বোধহয় কেউ এল, ডোর-বেল বেজে উঠল।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে ডোর-বেল বাজল। আমি অধীর আগ্রহে দরজা খুললাম। খুলে দেখি একটি মেয়ে। দেখতে মন্দ নয়। সে হেসে বলল, ঝুমা আমাকে পাঠিয়েছে।

বললাম, এসো, ভিতরে এসো।

মেয়েটি ভিতরে এল। আমি তাকে সোফায় আমার পাশে বসালাম। বসিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কি নাম তোমার?

—হেমা।

—বয়স কত?

—কুড়ি।

—কোমরটা একটু দেখি।

—কোমর দেখে কি করবেন?

—দরকার আছে।

হেমা কোমর দেখাল। আমি দেখেই চোখ ফিরিয়ে নিলাম। এ কোমর আমার চলবে না। ভীষণ চর্বি জমে গেছে। ধরতে অসুবিধে হবে। বললাম, তুমি আসতে পার।

হেমা জিজ্ঞেস করল, কি হল? কোমর পছন্দ হল না?

—না।

—কেন?

—আমি একটু সরু কোমর খুঁজছিলাম।

—আপনি আমায় সাতদিন সময় দিন। আমি কোমর সরু করে আনব। আপনার কত সরু কোমর চাই?

—কিন্তু আমি তো অপেক্ষা করতে পারব না। আমার এখনি চাই।

—এখনি কি করে হবে। আমি তাহলে আসি।

—এসো।

হেমা চলে গেল। একটু পরে আর একটা মেয়ে এল। নাম তরু। তরুর কোমর সরু ছিল। কিন্তু গায়ের রঙ ময়লা।

আমি একবার চোখ বুলিয়ে বললাম, চলবে না।

তরু জিজ্ঞেস করল, কেন?

—আমি ফর্সা মেয়ে খুঁজছিলাম।

—ফর্সা মেয়ে। কিন্তু আপনার গায়ের রঙ তো কালো।

আমি রেগে গিয়ে বললাম, আমি তো ছেলে। আমার গায়ের রঙ দিয়ে কি হবে? তুমি এখন এসো।

তরু চলে গেল। এরপর এল চাঁপা। চাঁপাকে দেখেই আমার পছন্দ হল। হ্যাঁ, ঠিক এইরকম মেয়েই আমি খুঁজছিলাম। ফর্সা রঙ, সরু কোমর, মাথা ভর্তি চুল, টানা-টানা চোখ, পাতলা ঠোঁট। এককথায় চমৎকার।

জিজ্ঞেস করলাম, তুমি আমার সঙ্গে থাকতে পারবে?

চাঁপা আমাকে ভালো করে দেখে নিয়ে বলল, না।

চমকে উঠলাম, কেন?

—আপনি বড় বেঁটে।

—তাতে কি।

—আপনার গায়ের রঙ কালো।

—তাতে কি।

—আপনার মাথায় তেমন চুল নেই।

—তাতে কি। আমি ছেলে।

—আমি এমন ছেলের সঙ্গে থাকতে চাই না। আপনাকে যে এত বাজে দেখতে, তা ঝুমা আমায় বলেনি। বললে, আসতাম না। যাকগে, চললাম। মাঝখান থেকে আমার সময়টাই নষ্ট হল।

চাঁপা আমাকে অপমান করে চলে গেল। আমি মন খারাপ করে বসে রইলাম।

একটু পরে ঝুমা এল। জিজ্ঞেস করল, কাউকে পছন্দ হল?

বললাম, চাঁপাকে পছন্দ হয়েছিল। কিন্তু...

—কিন্তু কি?

—আমাকে চাঁপার পছন্দ হল না।

—কেন?

—আমাকে নাকি দেখতে খারাপ।

—সেটা ও মিথ্যে বলেনি।

—তুমিও তাই বলছ?

—হ্যাঁ।

—অথচ তুমি আমাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলে।

—তুমি ভালো চাকরি কর, তাই চেয়েছিলাম।

—এছাড়া আমার কোন গুণ নেই?

—না।

—আমাকে ভালোবাসতে মেয়েদের কষ্ট হয়?

—তা হয়।

—বিবির কি কষ্ট হত?

—হত। আমাকে কতদিন সে কথা বলেছে।

—সেই কারণেই কি...

—হ্যাঁ, সেই কারণেই বলাই দত্তর সঙ্গে চলে গেল।

কথাটা আমার একদম ভালো লাগল না। আমি বিরক্ত হয়ে বসে রইলাম কিছুক্ষণ। তারপর বললাম, ঝুমা, তুমি এখন এসো। আমাকে একটু একা থাকতে দাও।

ঝুমা চলে গেল। আমি দরজা বন্ধ করে দিলাম। দিয়ে আয়নার সামনে এসে দাঁড়ালাম। নিজের চেহারাটার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলাম, আমি সত্যি খারাপ দেখতে? এত খারাপ যে, কোন মেয়ের পক্ষে আমাকে ভালোবাসা সম্ভব নয়? এটা ঠিক যে আমি বেঁটে, আমার গায়ের রঙ কালো, আমার মাথায় তেমন চুল নেই। কিন্তু আমার এই চোখ দুটো? এই নাক? না, চোখ দুটোও তেমন কিছু নয়। আর নাকটাই বা এমন কি। চাঁপা মিথ্যে কিছু বলেনি। ঝুমোও ঠিকই বলেছে। অথচ বিবি তো একদিন এই আমাকেই ভালোবেসেছিল। সে কি শুধু আমার টাকার জন্যে? হতেও পারে। কিন্তু সে টাকা তো আমার এখনো আছে। তবু বিবি চলে গেল কেন? বলাই দত্তর টাকা কি আমার থেকেও বেশি? হতে পারে। তবে পশ্চিমবঙ্গে মেয়ের অভাব নেই। আমার সঙ্গে থাকতে চায়, এমন মেয়ে নিশ্চয় পাব। আর পেয়েও তো ছিলাম। আমারই পছন্দ হল না। আমি ঠিক একজনকে জোগাড় করে নেব। অত দুশ্চিন্তার কিছু নেই।

এমন সময় আবার ডোর-বেল বাজল। আর দরজা খুলতে ভালো লাগছে না। এখন একটু শান্তিতে বিশ্রাম করতে চাই। কিন্তু দরজার দিকে পা বাড়াতেই হল। দরজা খুলতেই হল। খুলেই রীতিমত অবাক হলাম। দেখি, বিবি। জিজ্ঞেস করলাম, তুমি!

বিবি ঘরে ঢুকে বলল, অবাক হচ্ছ যে।

কঠিন গলায় জানতে চাইলাম, তুমি আবার এসেছ কেন?

—আমার খুশি।

—বলাই দত্তর কি হল?

—ওর সঙ্গে থাকত পারব না।

—কেন?

—আমি ওকে ভালোবাসি না।

—কি করে বুঝলে?

—ওর কাছে গিয়ে কেবলিই তোমার কথা মনে পড়ছিল।

—আমার কথা। সত্যি।

—বিশ্বাস কর।

—তাই চলে এলে?

—হ্যাঁ।

—বলাই দত্তর কি হবে ?

—তা দিয়ে আমার কি দরকার।

—কিন্তু ও যদি আবার এখানে আসে ?

—আমি আর ওকে এখানে ঢুকতেই দেব না।

এবার একটু থেমে কঠিন গলায় বললাম, কিন্তু আমি তোমাকে এখানে থাকতে দেব না।

বিবি ক্ষুণ্ণ হয়ে বলল, কেন ?

—তুমি আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছ।

—আর করব না।

—আমি তোমাকে বিশ্বাস করি না।

—আমাকে ক্ষমা কর।

—কি করে করব ? তুমি তো আবার...

—আর এরকম হবে না। আমি কথা দিচ্ছি।

আমার মন এতে নরম হল। জিজ্ঞেস করলাম, ঠিক ?

বিবি বলল, ঠিক।

এরপর আর কি করব ? বিবিকে ক্ষমা করে দিলাম। বললাম, তাহলে যাও, এখনি এক কাপ চা করে নিয়ে এসো।

বিবি সঙ্গে সঙ্গে চা করে নিয়ে এল।

কিছুদিন পরে অফিসের কাজে আবার আমায় বাইরে যেতে হল। প্রায় দশদিন পরে ফিরলাম। ডোর-বেল টিপলাম। টিপতেই বলাই দত্ত দরজা খুলে দিল। আমি আঁতকে উঠলাম। দেখি, বলাই দত্ত এবার একা নয়। বলাইয়ের পিছনে দাঁড়িয়ে আছে মিস্টার সেন, থানার ও সি, দাশবাবু এবং আরো অনেকে। আমাকে দেখেই প্রায় সকলে একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল, কাকে চাই ?

ইন্দুবাবুর কপাল

ঠিক সন্ধে সাতটার সময় অফিস থেকে বাড়ি ফিরলেন ইন্দুবাবু। তখন তাঁর স্ত্রী বাসন্তী দেবী টিভি দেখছিলেন। পাশে তাঁর একমাত্র ছেলে বাপী বসে ছিল। স্বামীকে দেখেই বাসন্তী দেবী টিভি বন্ধ করে দিলেন।

ইন্দুবাবু জিজ্ঞেস করলেন, কি হল? টিভি বন্ধ করে দিলে কেন?

বাসন্তী দেবী বললেন, তোমার সঙ্গে আজ কথা আছে।

—কি কথা?

—আগে জামা কাপড় ছাড়ো, হাতমুখ ধোও, তারপর বলছি।

—খুব দরকারী কথা?

—হ্যাঁ।

ইন্দুবাবু বেশ অবাক হলেন। বুঝতে পারলেন না তাঁর সঙ্গে তাঁর স্ত্রীর এমন কি দরকারী কথা থাকতে পারে। পঁচিশ বছর বয়সে তাঁর বিয়ে হয়েছিল। এখন তাঁর বয়স বাহান্ন। এই দীর্ঘ সাতাশ বছর ধরে তিনি তাঁর স্ত্রীকে দেখে আসছেন। দেখে আসছেন তাঁকে শুধু ঘুমিয়ে থাকতে, বসে থাকতে, সাজগোজ করতে আর ঘুরে বেড়াতে। তাঁর সঙ্গে কোনদিন কোন ভালোবাসার কথা বলা দূরে থাক, সামান্য গল্পগুজবও করেনি। এমনকি কোনদিন বলেনি, ওগো, আজ তোমার সঙ্গে একটা দরকারী কথা আছে। ইন্দুবাবু তাই আজ একটু চিন্তায় পড়ে গেলেন। হঠাৎ কি হল? যাই হোক, ইন্দুবাবু তাড়াতাড়ি জামাকাপড় ছেড়ে হাত মুখ ধুয়ে স্ত্রীর সামনে এসে বসলেন।

বাসন্তী দেবী জিজ্ঞেস করলেন, চা খাবে?

ইন্দুবাবু এ প্রশ্নেও অবাক হলেন। কারণ তাঁর মনে পড়ে না তাঁর স্ত্রী তাঁকে কোনদিন এভাবে চা খাওয়ার কথা জিজ্ঞেস করেছে। বাড়িতে কাজের লোক আছে। সেই তাঁকে রোজ চা করে দেয়। বলতেও হয় না। তবু স্ত্রীর এই প্রশ্নে তিনি খুশী হলেন। বললেন, খাব।

বলা মাত্র তাঁর স্ত্রী কাজের লোককে ডেকে বললেন, এক্ষুনি বাবুর চা করে দাও।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে চা চলে এল। ইন্দুবাবু এক অদ্ভুত তৃপ্তিতে চায়ে চুমুক দিতে দিতে বললেন, বলো, কি বলছিলে ?

—বলছি, চা-টা শেষ করো।

ইন্দুবাবু অসম্ভব কৌতূহলী হয়ে পড়েছিলেন। আর অপেক্ষা করতে পারছিলেন না।

তাড়াতাড়ি চা শেষ করে বললেন, এবার বলো।

বাসন্তী দেবী এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার বয়স কত হয়েছে ?

—হঠাৎ এ প্রশ্ন ?

—দরকার আছে।

—বাহান্ন।

—তার মানে তুমি এখনো আট বছর চাকরি করবে।

—হ্যাঁ।

বাসন্তী দেবী গম্ভীর হয়ে বললেন, অতদিন তোমার চাকরি করা চলবে না।

ইন্দুবাবু এ কথার অর্থ বুঝতে পারলেন না। না পেরে জিজ্ঞেস করলেন, মানে ? কি বলতে চাও তুমি ?

—বলতে চাই, তোমার অফিসে ছেলেটাকে এবার ঢোকাও।

—কি ভাবে ?

—তোমার অফিসে বাবারা রিটায়ার করলে ছেলেরা তো চাকরি পায়, পায় না ?

—তা পায়। কিন্তু আমার রিটায়ার করতে এখনো আট বছর দেরি আছে।

—বাপী ততদিন বসে থাকবে ?

—বসে থাকবে কেন ? অন্য কোথাও চেষ্টা করুক।

—চেষ্টা তো অনেক করেছে। কিন্তু কোথাও তো পেল না।

—তার জন্যে আমি কি করব ?

বাপী এতক্ষণ চুপ করে বসে ছিল। একটা কথাও বলেনি। এবার আর পারল না। বলে উঠল, তুমি স্বেচ্ছায় রিটায়ার করো, তাহলেই আমার একটা ব্যবস্থা হয়।

ইন্দুবাবু বললেন, তা হয়। কিন্তু তারও পাঁচ বছর দেরি আছে।

বাসন্তী দেবী এতে যেন বিরক্ত হয়ে বললেন, আরো পাঁচ বছর।

—হ্যাঁ।

—যদি মরে যাও?

ইন্দুবাবু এবার রীতিমত ধাক্কা খেলেন। কি শুনছেন তিনি? নিজের কানকে তাঁর বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হল না। তিনি কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে রইলেন। বুঝতে পারলেন বাড়ি ঢুকতে না ঢুকতে তাঁকে আজ হঠাৎ এত খাতির করা হল কেন। তিনি যেন একটা চক্রান্তের আঁচ পেলেন। তাঁর এই মুহূর্তে প্রচণ্ড রাগে ফেটে পড়তে ইচ্ছে হল। কিন্তু স্ত্রী ও পুত্রের মুখের দিকে চেয়ে নিজেকে ভীষণ অসহায় বোধ করলেন। তিনি মুখ ফুটে কিছু বলতে পারলেন না।

স্বামীকে নিরুত্তর দেখে বাসন্তী দেবী আবার জিজ্ঞেস করলেন, কি হল? চুপ করে আছ কেন? কথার উত্তর দাও। যদি মরে যাও?

ইন্দুবাবু ম্লান হেসে উত্তর দিলেন, তাহলে বাপী এখনি চাকরি পাবে।

—সত্যি?

—হ্যাঁ।

—তাহলে তুমি এখনি মরে যাও।

—কি বলছ তুমি!

—ঠিক বলছি। তুমি এখনি মরে যাও।

স্ত্রীর এই কঠোর নির্দেশে ইন্দুবাবু ভীত হয়ে পড়লেন। জীবনে তিনি কোনদিন স্ত্রীর কোন কথা অবহেলা করেননি। সংসারে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্যে সব সময় তা মান্য করে এসেছেন। কখনো অবাধ্য হননি। কিন্তু আজ স্ত্রীর এই অদ্ভুত নির্দেশ পালন করা তাঁর কাছে অসম্ভব ও ভয়ঙ্কর বলে মনে হল। স্ত্রীকে খুশি করার জন্যে তিনি আর যাই করুন মরে যেতে পারবেন না।

বাসন্তী দেবী তাঁকে নীরব থাকতে দেখে ধমকের সুরে জিজ্ঞেস করলেন, কি হল? কথার উত্তর দিচ্ছ না কেন?

ইন্দুবাবু মৃদু গলায় বললেন, কি বলব!

—তার মানে? তুমি মরবে না?

ইন্দুবাবু এবার তাঁর পুত্রের দিকে তাকালেন

তাঁর মৃত্যুর বিরুদ্ধে একটা মত আদায়ের জন্যে স্নেহমিশ্রিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, তুই কি বলিস? তুই কি চাস আমি মরে যাই?

উত্তরে বাপী তার মার প্রস্তাবকেই সমর্থন করে বলল, হ্যাঁ, আমি চাই তুমি মরে যাও।

পুত্রের কাছ থেকে ইন্দুবাবু এতটা আশা করেন নি। তাই তিনি আহত কণ্ঠে বলে উঠলেন, তুই একথা বলতে পারলি!

—বলতে বাধ্য হচ্ছি।

—কারণ?

—কারণ তুমি অনেকদিন বেঁচে থেকেছ। আর কতদিন বাঁচবে। এবার আমাকে বাঁচতে দাও।

—তুই কি বেঁচে নেই?

—না, আমি বেঁচে নেই।

—কেন? কি হয়েছে?

—আমি বেকার। আমি এখন একটা চাকরি পেতে চাই, বিয়ে করতে চাই, জীবনকে ভোগ করতে চাই। এদিকে আমার বয়স হয়ে যাচ্ছে। তুমি না মরলে তা সম্ভব হচ্ছে না।

পুত্রের এ কথায় ইন্দুবাবুর মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর কোন রক্তের সম্বন্ধ নেই। সে স্বচ্ছন্দে বলতে পারে, তুমি মরে যাও। কিন্তু পুত্রের সঙ্গে তাঁর রক্তের সম্বন্ধ। সে কি করে একথা বলতে পারল! বলতে গিয়ে তার মুখে আটকাল না? জিভ জড়িয়ে গেল না? মনে হল না একথা বলা ঠিক নয়, বললে বাবা কষ্ট পাবে? তিনি অবাক বিস্ময়ে পুত্রের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। ভাবতে কষ্ট হল, একেই তিনি বুকে পিঠে করে মানুষ করেছেন। এরই সামান্য অসুখ হলে দুশ্চিন্তায় ঘুমোতে পারতেন না। এরই ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে এই ফ্ল্যাট কিনেছেন। ব্যাঙ্কে না খেয়ে টাকা জমিয়েছেন। ইন্দুবাবুর মনে হল তাঁর মরে যাওয়াই ভালো।

এমন সময় একটি মেয়ে ঘরে ঢুকল। নাম বাবলি। পাশের ফ্ল্যাটে থাকে। বাপীর সঙ্গে বেশ কয়েক বছর ধরে ঘোরাঘুরি করছে। কিন্তু বাপী বেকার বলে কিছুতেই তাকে বিয়ে করতে রাজী হচ্ছে না। তার দিকে তাকিয়ে বাসন্তী দেবী বললেন, বসো।

বাবলি বাপীর পাশে গিয়ে বসল। বসে চারদিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, কি ব্যাপার?

বাসন্তী দেবী বললেন, তুমি তোমার মেসোমশাইকে একটু বোঝাও

তো দেখি।

—কি বোঝাব?

—বোঝাও যে তোমার মেসোমশাইয়ের এখন মরা উচিত। মরলে তোমার মেসোমশাইয়ের অফিসে বাপী চাকরি পায়। আর চাকরি পেলে তোমায় বিয়ে করতে পারে। আমি বুঝতে পারছি না তোমার মেসোমশাইয়ের এতে অমত হচ্ছে কেন?

বাবলি এবার ইন্দুবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, মাসিমা তো অন্যায় কিছু বলছেন না। আপনি আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে মরে যান। বাপীর জন্যে এটুকু আপনার করা উচিত।

ইন্দুবাবু এবার বাবলির মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আমার মরা কি খুব জরুরি?

সঙ্গে সঙ্গে সকলেই একবাক্যে বলে উঠল, হ্যাঁ, খুব জরুরি?

—কিন্তু যদি না মরি?

বাসন্তী দেবী বোধহয় স্বামীর কাছ থেকে এরকম কথা আশা করেননি। তাই তিনি বিরক্ত হয়ে বললেন, এর মানে? কি বলতে চাও তুমি?

—আমি মরব না, আমি বেঁচে থাকব।

—অসম্ভব। বেঁচে থাকা তোমার চলবে না। তোমাকে যে করেই হোক মরতে হবে, সে বিষ খেয়েই হোক বা গলায় দড়ি দিয়েই হোক।

ইন্দুবাবু এবার গলার স্বর উঁচু করে বললেন, আমি কিছুতেই মরব না। তোমরা যা পার করো।

বাসন্তী দেবী এ কথায় উত্তেজিত না হয়ে শান্ত গলায় ঠাট্টা করে বললেন, মরতে ভয় পাচ্ছ?

—ভয় পাব কেন?

—তাহলে?

—আমি এখন বেঁচে থাকতে চাই।

—কেন?

—সামনের মাসে কলকাতায় ভারত পাকিস্তানের টেস্ট খেলা হবে। ওটা দেখতে হবে।

—আর?

—আর···আর কলকাতায় দু মাস পরে ফিল্ম ফেস্টিভাল হবে। অনেক

ভালো ছবি আসবে শুনছি। সেসব ছবি না দেখে মরতে পারব না।

—আর?

—আর...আর...আমরা অফিসের কয়েকজন মানস সরোবর যাব ঠিক করেছি। মানস সরোবর আমি দেখবই। না দেখে মরে যাওয়া অসম্ভব।

—এই তোমার শেষ কথা?

—হ্যাঁ, এই আমার শেষ কথা।

ইন্দুবাবুর এরকম আকস্মিক দৃঢ়তায় সকলেই চুপ করে গেল। বাসন্তী দেবী কি বলবেন তা খুঁজে পেলেন না। রাগে তাঁর মুখ থমথম করতে লাগল। বাপীও বুঝে পেল না এবার সে কি করবে বা কি বলবে। আর বাবলি মুহূর্তের মধ্যে পরিস্থিতিটা বুঝে নিয়ে বাসন্তী দেবীর উদ্দেশে বলল, মাসিমা, আমি তাহলে চলি?

বাসন্তী দেবী বললেন, না। তুমি বসো।

বাবলি বলল, আমি বসে থেকে কি করব?

—মেসোমশাই তো মরতে রাজি নন। আমি বরং চলে যাই।

বাপী জিজ্ঞেস করল, কোথায় যাবে?

—ভাবছি বুকির কাছে যাব।

—বুকির কাছে। খবরদার। বুকির কাছে তোমার যাওয়া হবে না।

—কেন?

—আমি তাহলে আত্মহত্যা করব।

—যার এমন বাবা তার আত্মহত্যা করাই ভালো।

বাপী এককথায় উত্তেজিত হয়ে মার উদ্দেশে বলল, তুমি শুনলে বাবলি কি বলল।

বাসন্তী দেবী উত্তরে বললেন, বাবলি মিথ্যে কিছু বলেনি। তোর আত্ম-হত্যা করাই ভালো।

ইন্দুবাবু বুঝতে পারলেন তাঁর আর এখানে বসে থাকা উচিত নয়। বসে থাকলে তাঁকে নানা কটু কথা শুনতে হবে। অথচ কিছুই বলতে পারবেন না। মুখ বুজে সব হজম করতে হবে। তার চেয়ে এখান থেকে সরে যাওয়াই ভালো। তিনি উঠে দাঁড়ালেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর স্ত্রী চেঁচিয়ে উঠলেন, কোথায় যাচ্ছ?

—বাইরে।

—বাইরে মানে?

—বাইরে মানে বাইরে। তোমার কথা আর ভালো লাগছে না।

—না লাগুক। তোমার কোথাও যাওয়া হবে না। তোমাকে এখানে বসে থাকতে হবে।

ইন্দুবাবুর আর বাইরে যাওয়া হল না। তিনি পুনরায় বসে পড়ে বললেন, বসে থেকে কি করব?

—আমি বিষ এনে দিচ্ছি, খাবে। খেয়ে মরবে। তোমাকে আমি কিছুতেই বেঁচে থাকতে দেব না। তুমি আরাম করে চাকরি করবে আর ছেলেটা বেকার হয়ে ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াবে, তা হবে না, হতে দেব না। তোমাকে এখনি বিষ খেয়ে মরতে হবে।

—আমি মরব না।

—মরবে না। গুলি করে মারব।

—পিস্তল কোথায় পাবে?

—তার জোগাড় হয়ে আছে।

—কই, দেখি।

বাসন্তী দেবী তখন পুত্রের দিকে তাকিয়ে বললেন, বাপী, পিস্তলটা বের করত, একবার দেখিয়ে দে।

বাপী সঙ্গে সঙ্গে হিপ পকেট থেকে পিস্তল বের করল। ইন্দুবাবু পিস্তলটার দিকে তাকিয়ে শিউরে উঠলেন। জিজ্ঞেস করলেন, কোত্থেকে জোগাড় করেছিস?

বাপী একথায় হেসে উঠল। তারপর পিস্তলটা ফের হিপ পকেটে ঢুকিয়ে বলল, তা দিয়ে তোমার দরকার কি।

ইন্দুবাবু এতক্ষণে ভীত হলেন। না, আর তাঁর বাঁচার উপায় নেই। তাঁকে মরতেই হবে। সে বিষ খেয়েই হোক বা গুলি খেয়েই হোক। এদের হাত থেকে তাঁর রেহাই নেই। কিন্তু তাঁর মরে যাবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই। তিনি ভাবতে লাগলেন এদের হাত থেকে এখন কি ভাবে উদ্ধার পাওয়া যায়।

বাসন্তী দেবী এই সময় তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, বলো এবার মরবে কিনা?

আপাতত বাঁচবার জন্যে ইন্দুবাবু বললেন, মরব, নিশ্চয় মরব!

সঙ্গে সঙ্গে বাসন্তী দেবী, বাপী ও বাবলির মুখে হাসি ফুটে উঠল।

বাসন্তীদেবী বললেন, বাঁচলাম।

বাপী বলল, ঘাম দিয়ে যেন জ্বর ছাড়ল।

বাবলি বলল, আমিও নিশ্চিন্ত হলাম।

এমন সময় এক প্রৌঢ় ঘরে ঢুকলেন। বয়স প্রায় পঞ্চান্ন। নাম রতন হালদার। পেশায় ডাক্তার। ইনি বাবলির পিতা। এঁকে দেখেই বাসন্তী দেবী বলে উঠলেন, সুখবর আছে।

রতনবাবু হেসে বললেন, কি?

—আমার কর্তা মরতে রাজি হয়েছেন।

—তাই নাকি।

—হ্যাঁ।

—আমি জানতাম উনি বাপীঅন্ত প্রাণ। বাপীর জন্যে উনি মরতে পিছপা হবেন না। আপনারা আমার কথা বিশ্বাস করেননি। এখন বিশ্বাস হল তো।

এই বলে রতনবাবু ইন্দুবাবুর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তা কবে মরবেন?

ইন্দুবাবু ম্লান হেসে জানতে চাইলেন, কবে মরলে সুবিধে হয়?

—এখনি।

ইন্দুবাবু আঁতকে উঠলেন, এখনি?

রতনবাবু বললেন, আপত্তি কিসের?

—কিন্তু এখনি মরলে আপনারা ঝামেলায় পড়ে যাবেন।

—কোন ঝামেলা হবে না। ডেথ সার্টিফিকেট তো আমি লিখব।

ইন্দুবাবু এবার একটু থেমে জানতে চাইলেন, আপনারা আমাকে কীভাবে মারতে চান?

—বিষ খাইয়ে কিংবা গুলি করে। কিংবা...সে নিয়ে আপনাকে ভাবতে হবে না।

—না, ভাবার আছে। আমাকে একটু ভাবতে দিন।

—কি ভাববেন? কি ভাবার আছে?

—আছে, ভাবার আছে। আমি একটু বাইরে থেকে ঘুরে আসি।

বাসন্তী দেবী এই সময় প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন, অসম্ভব।

বাপী বলল, তোমার কোথাও যাওয়া হবে না।

বাবলি বলল, আপনাকে এখানেই থাকতে হবে।

রতনবাবু বললেন, আপনাকে এখন কিছুতেই বাইরে বেরতে দেওয়া যায় না। দিলেই আপনি হয়ত থানায় গিয়ে হাজির হবেন।

সবাই একসঙ্গে বলে উঠল, ঠিক ঠিক।

তখন ইন্দুবাবু বললেন, বেশ, তাই হবে। আমি বাইরে না হয় বেরব না। কিন্তু আমাকে দয়া করে একটু ভাবতে দিন।

রতনবাবু আবার জানতে চাইলেন, কি ভাববেন?

—ভাবব আমার মৃত্যুর পর এই ফ্ল্যাট কে পাবে, পি এফ-এর টাকা কে পাবে, ইন্দিরা বিকাশ পত্র কে পাবে।

—এ নিয়ে ভাবার কি আছে! আপনার মৃত্যুর পর সবই আপনার ছেলে পাবে।

এ কথায় বাসন্তী দেবী প্রায় গর্জে উঠলেন, না, তা হবে না। আমি বেঁচে থাকতে বাপী পাবে কেন? ওঁর মৃত্যুর পর সব কিছুর মালিক হব আমি।

রতনবাবু বললেন, তাহলে তো সমস্যা থেকেই গেল।

বাসন্তী দেবী বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কিসের সমস্যা?

—আপনি সব কিছুর মালিক হলে বাপী কি পাবে?

—এখন কিছু পাবে না। আমার মৃত্যুর পর সব বাপী পাবে।

—কিন্তু ধরুন আপনি যদি এখনো কুড়ি পঁচিশ বছর বেঁচে থাকেন।

—বাপীকে ততদিন অপেক্ষা করতে হবে।

—সে হয় না।

—কেন?

—বাপী আর বাবলি কি অতদিন আপনার অধীনে থাকতে চাইবে? তবে ওরা যদি থাকতে চায় আমার আপত্তি নেই।

বাবলি এ সময় বলল, আমি কারো অধীনে থাকতে পারব না।

বাপী বলল, আমিও না।

বাসন্তী দেবী এবার ক্ষিপ্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তোরা কি বলতে চাস?

বাপী বলল, বাবার মৃত্যুর পর সবকিছুর মালিক হব আমি।

—আমি বেঁচে থাকতে?

—হ্যাঁ।

—আমার কি হবে?

—তুমি আমাদের সঙ্গে থাকবে।

—থেকে কি করব ?

—রান্না করবে, ঘর মুছবে, কাপড় কাচবে, নাতি-নাতনী সামলাবে।

—আমি তা পারব না।

—তাহলে তুমি অন্য কোথাও চলে যেও।

বাসন্তী দেবীর গলার স্বর রীতিমত তীব্র হয়ে উঠল, কি বললি ?

বাপী শান্ত গলায় বলল, আমি ঠিক বলেছি। অন্যায় কিছু বলিনি। রতনবাবুও বাপীর কথায় সায় দিয়ে বলল, হ্যাঁ, ও তো অন্যায় কিছু বলেনি। বাপীর সুখের জন্যে ইন্দুবাবু মরতে রাজি হয়েছেন। আমি বলি এইসঙ্গে আপনারও মরে যাওয়া উচিত।

বাসন্তী দেবী বেশ ক্ষুব্ধ হয়ে বলে উঠলেন, আপনি আমাকে মরে যেতে বলছেন ?

রতনবাবু ঠাণ্ডা গলায় বললেন, হ্যাঁ, কারণ এতে আপনার বাপীর এবং আমার বাবলির উভয়ের কল্যাণ হবে।

বাসন্তী দেবী এবার বাপীর দিকে তাকিয়ে জানতে চাইলেন, তোরও কি তাই মত ?

বাপী বলল, হ্যাঁ, আমারও তাই মত। বাবার সঙ্গে তুমিও যদি মরে যাও তাহলে আমার ভালো হয়।

বাসন্তী দেবী তখন নিরুপায় হয়ে বললেন, ঠিক আছে, তাই হবে। কিন্তু···

—কিন্তু কি ?

—মরবার আগে একটা লেখাপড়া করে যাব।

—কি ?

—আমাদের মৃত্যুর পর আমাদের যাবতীয় স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির মালিক হবে শুধু তুমি।

বাপী বলল, এত খুব ভালো কথা।

কিন্তু বাবলি এর প্রতিবাদ করে বলল, না, এটা মোটেই ভালো কথা নয়।

বাপী জিজ্ঞেস করল কেন ?

বাবলি বলল, তুমি বড় খরচে। সব হাতে পেয়ে দুদিনেই উড়িয়ে দেবে। তখন আমার কি হবে ? অতএব মালিক হব আমি।

বাপী বলল, আমার বাবার জিনিস। মালিক হব আমি।

বাবলি বলল, আমার এতে আপত্তি আছে।

রতনবাবু এসময় বাপীকে বললেন, ও ঠিক বলেছে বাপী। সব ওর নামে থাকাই ভালো। তুমি যে বড় অমিতব্যয়ী।

বাপী বলল, সে আমি বুঝব।

রতনবাবু বললেন, না, তা হয় না, আমি বাবলির বাবা, ওর ভালোমন্দ দেখার দায়িত্ব আমার। তোমার নামে কিছুই রেখ না। সব বাবলির নামেই হোক। এতে তোমার কল্যাণ হবে।

বাপী বলল, এতে আমার কোন কল্যাণ হবে না। কল্যাণ হবে বাবলির।

—কেন ?

—বাবলি যদি আমাকে এখান থেকে কোনদিন তাড়িয়ে দেয়, আমি তখন কি করব ?

—ছিঃ ছিঃ, এসব কি বলছ।

—ঠিক বলছি। আমার বাবার জিনিস, আমিই মালিক হব।

বাবলি এ কথায় বলে উঠল, তাহলে আমি তোমাকে বিয়ে করতে পারব না। আমি বুকিকেই বিয়ে করব।

—তাই কর। তোমাকে আর আমার দরকার নেই। পয়সা থাকলে তোমার মত মেয়ে অনেক পাব।

—কি বললে ?

—ঠিক বলেছি। তুমি এখন যেতে পার।

তাই যাব।—বলে বাবলি উঠে দাঁড়াল।

রতনবাবু ধমক দিলেন, বাবলি! ছেলেমানুষি করিস না।

বাবলি বলল, না বাবা, আমি এখন বুকির কাছেই যাব। আমি বুকিকেই বিয়ে করব। তুমি আমাকে বাধা দিও না।

রতনবাবু আবার ধমক দিলেন, বাবলি!

বাবলি ধমক খেয়ে দাঁড়াল না। ঘর ছেড়ে চলে গেল। রতনবাবুও তার পিছু পিছু ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

ইন্দুবাবু এতক্ষণ একটা কথাও বলেননি। সব কথা চুপ করে শুনছিলেন। এবার একবার পুত্রের মুখের দিকে তাকিয়ে একবার স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তাহলে কি দাঁড়াল শেষ পর্যন্ত ?

বাসন্তী দেবী বললেন, আমাদের বোধহয় আর মরতে হবে না।

ইন্দুবাবু খুশি হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, সত্যি ?

—তাই তো মনে হচ্ছে।

বাপী এই সময় বলল, না মা, তুমি বেঁচে থাকতে পার। কিন্তু বাবার বেঁচে থাকা চলবে না।

ইন্দুবাবু ক্ষুব্ধ হয়ে জানতে চাইলেন, আমার অপরাধ ?

—আমার এখন চাকরি চাই। তুমি না মরলে আমার চাকরি হবে না।

বাসন্তী দেবী স্বামীর প্রতি সহানুভূতি দেখিয়ে বললেন, আমার তাহলে করার কিছু নেই। তোমাকে মরতেই হবে।

ইন্দুবাবু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, তাহলে তাই হবে। কিন্তু আমি আর কটা দিন বাঁচতে চাই।

বাপী জিজ্ঞেস করল, কদিন ?

—সাতদিন।

—ঠিক আছে, সাতদিনই পাবে। এর বেশি কিন্তু একদিনও বাঁচা চলবে না।

—তাই হবে।

—মনে থাকে যেন।

কিন্তু ইন্দুবাবুর কপাল খারাপ। সাতদিন কেন, সে রাতটাই পুরো কাটাতে পারলেন না। ঠিক তিনটের সময় মনের দুঃখে মারা গেলেন।

ভোলা ও মন্ত্রীপুত্র

অফিস যাবার মুখে ভোলার হাতে একজন একটা চিঠি দিয়ে গেল। বাচ্চুদার চিঠি। চিঠিতে বাচ্চুদা লিখেছেন: আজ রাত নটায় বাড়িতে আসবি। জরুরী কথা আছে। কিন্তু কি কথা তা চিঠিতে লেখা নেই। ফলে ভোলা সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে অফিসে গিয়ে হাজির হল। তারপর নিজের চেয়ারে বসে জল খেয়ে কলম পিষতে পিষতে হঠাৎ তার মনে পড়ল সে একবার বাচ্চুদাকে বলেছিল, বাচ্চুদা। আমার ভাই পাঁচ বছর ধরে বেকার। আপনি ওকে একটা চাকরি জুটিয়ে দিন। একটু পরে ভোলার আবার মনে পড়ল, বাচ্চুদাকে সে আর একবার অনুরোধ করেছিল, বাচ্চুদা। বাবা শিক্ষকতা থেকে ছ-বছর হল রিটায়ার করেছেন। এখনও পেনশন পাচ্ছে না। আপনি তাড়াতাড়ি পেনশনের ব্যবস্থা করে দিন। বাচ্চুদা এখন মন্ত্রী। বাচ্চুদা এখন ইচ্ছে করলে সব পারেন, বাচ্চুদার হাতে এখন অসীম ক্ষমতা। তবে বাচ্চুদার হাতে ক্ষমতা আছে বলেই যে তাঁকে সকলের অন্যায় আবদার রাখতে হবে তার মানে নেই, তিনি সচরাচর তা রাখেনও না, তবে ভোলার কোন আবদারই অন্যায় নয়। ভাইয়ের চাকরি বা বাবার পেনশন—দুটোই খুব ন্যায্য অনুরোধ। এছাড়া সে বাচ্চুদার জন্যে কম করেনি। সে গত নির্বাচনে বাচ্চুদার হয়ে অনেক কাজ করেছে—পাড়ার মোড়ে মোড়ে বক্তৃতা দিয়েছে, দেয়ালে দেয়ালে পোস্টার মেরেছে, দলের পতাকা নিয়ে সকাল সন্ধে মিছিল করেছে। বাড়ি বাড়ি গিয়ে হাতজোড় করে ভোট চেয়েছে, এমনকি বোমা মেরে বিরোধীপক্ষের অনেক সভাও পণ্ড করেছে। অতএব সে ভাইয়ের চাকরি ও বাবার পেনশনের কথা বলতেই পারে। আর বাচ্চুদা ইচ্ছে করলেই এ দুটো করে দিতে পারেন। কিন্তু কেন যে বাচ্চুদা আজও কিছু করছেন না তা ভগবানই জানেন।

আজ ভোলার মনে হল, বাচ্চুদা এবার হয়ত তার জন্যে কিছু করবেন। আর সেই কারণেই হয়ত এই চিঠি। ভোলা একথা ভেবে আশান্বিত হল।

২

অফিসে বিকেলের দিকে চম্পার ফোন এল। চম্পা ভোলার সঙ্গে কলেজে পড়ত। চম্পার বাবা একজন শিল্পপতি, লাখ লাখ টাকার মালিক। তবে এর জন্যে চম্পার মধ্যে কোন অহঙ্কার নেই। কলেজ জীবনের পরেও চম্পা তাকে ভোলেনি। এখনও তাকে মাঝে মাঝে অফিসে ফোন করে, একসঙ্গে সিনেমা দেখে, একসঙ্গে রেস্তরাঁয় গিয়ে মোগলাই পরোটা খায়, এক একসময় ভালোবাসার কথাও বলে। হয়ত এই করতে করতে একদিন বিয়ের কথাও উঠতে পারে। যদি ওঠে, তাহলে সে নিজেকে অত্যন্ত ভাগ্যবান মনে করবে। ভোলার দুঃখ, আজও সে প্রস্তাব ওঠেনি।

চম্পার সঙ্গে ভোলার ফোনে এইরকম কথা হল ঃ

—হ্যালো। ভোলা?

—হ্যাঁ।

—আমি চম্পা। আজ অফিস ছুটির পর কি করছ?

—কিছু না।

—তাহলে অফিস ছুটির পর আমাদের বাড়ি এস।

—কিন্তু বেশিক্ষণ থাকতে পারব না। এক জায়গায় নটার সময় অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে।

—ঠিক আছে, তার আগেই ছেড়ে দেব।

—কোন দরকার আছে?

—বাবা তোমার সঙ্গে কথা বলতে চায়।

—কি কথা?

—জানি না।

ফলে অফিস ছুটির পর ভোলা বাড়ি গেল না, চম্পার কাছে গেল চম্পার পায় পায় তার আদরের পমিরেনিয়ান ঘুরঘুর করছিল। সে তাকে দেখে ঘেউ ঘেউ করে এগিয়ে এল। কিন্তু চম্পার ধমক খেয়ে চুপ করে গেল। চম্পা ভোলাকে ডেকে নিয়ে বসার ঘরে ঢুকল। তাকে সোফায় বসিয়ে জিজ্ঞেস করল, চা না কফি?

ভোলা বলল, কফি।

চম্পা সঙ্গে সঙ্গে ভিতর থেকে এককাপ কফি এনে ভোলার হাতে তুলে দিল। ভোলা হাতে কফি নিয়ে একটা চুমুক দিল। দিয়ে জিজ্ঞেস করল,

মেসোমশাই কোথায় ?

চম্পা ভোলার সামনের সোফায় বসে বলল, কফি খাচ্ছে। এখনি আসবে।

—আমার কিন্তু চিন্তা হচ্ছে।

—কেন ?

—কি যে উনি বলবেন বুঝতে পারছি না। তোমাকে কিছু বলেননি ?

—না। আমাকে শুধু বলল, ভোলাকে আজ সন্ধেবেলা বাড়িতে আসতে বলিস। ওর সঙ্গে কথা আছে।

—তুমি জিজ্ঞেস করলে না কেন কি কথা।

—করেছিলাম, কিন্তু বাবা কিছু বলল না।

—কিছু অনুমান করতে পার ?

—না।

ঠিক এই সময় চম্পার বাবা ঘরে ঢুকলেন। তাঁকে সম্মান দেখানোর জন্যে ভোলা উঠে দাঁড়াল।

চম্পার বাবা চম্পার পাশে বসে ভোলার উদ্দেশে বললেন, বসো।

ভোলা আবার বসল। বসে কফিতে চুমুক দিতে দিতে জিজ্ঞেস করল, আপনার শরীর কেমন আছে ?

ভাল।—বলে চম্পার বাবা বললেন, তোমার সঙ্গে আজ আমার জরুরী কথা আছে।

—কি কথা ?

—বলছি। কফিটা আগে খেয়ে নাও।

ভোলা উদ্বিগ্ন হয়ে দ্রুত কফিটা শেষ করল।

চম্পার বাবা তখন শুরু করলেন, তোমার সম্পর্কে একটা কথা শুনলাম।

—কি কথা ?

—কথাটা ভাল নয়।

ভোলার মুখ শুকিয়ে গেল। কিছু বলতে পারল না।

চম্পার বাবা প্রশ্ন করলেন, তুমি নাকি বামপন্থীদের সঙ্গে মেশো ? তাদের হয়ে মিছিল বের কর ? বক্তৃতা দাও ?

ভোলা আমতা আমতা করে বলল, হ্যাঁ, আপনি ঠিকই শুনেছেন।

চম্পার বাবা এবার মুখটাকে বিকৃত করে বললেন, কিন্তু তুমি তো জানো আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি, আমরা ব্যক্তিস্বাধীনতায় বিশ্বাস করি। আমরা

বামপন্থীদের দুচক্ষে দেখতে পারি না, তারা মিথ্যেবাদী, ধাপ্পাবাজ। তারা দেশের শত্রু। তুমি আর কোনদিন এ বাড়িতে এসো না।

চম্পা প্রায় আর্তনাদ করে উঠল, বাবা।

চম্পার বাবা উঠে দাঁড়ালেন। চম্পাকে বললেন, চম্পা! ভোলার জন্যে দুঃখ কর না। আমি তোমার জন্যে কাল এক বামপন্থী নেতার দক্ষিণপন্থী ছেলে এনে দেব।

চম্পা বাবাকে বোঝানোর চেষ্টা করল, বাবা, ভোলা খুব ভাল ছেলে। তুমি আমার কথা শোন...

চম্পার বাবা মেয়ের কথা শুনলেন না। ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

ভোলা কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইল।

৩

ঠিক রাত নটার সময় ভোলা কথামত বাচ্চুদার কাছে গেল। বাচ্চুদা তখন দলবল নিয়ে তাঁর বসার ঘরে বসে আছেন। তার মধ্যে বাচ্চুদার ছেলে জয়ন্তও আছে। জয়ন্ত ইদানীং শিল্পপতিদের সঙ্গে ওঠাবসা শুরু করেছে। তবে এ নিয়ে কারও কিছু বলার সাহস নেই।

ভোলাকে দেখেই বাচ্চুদা বললেন, তোর জন্যেই বসে আছি।

ভোলা আসন গ্রহণ করল।

বাচ্চুদা ভোলার মুখের দিকে তাকিয়ে কিছু একটা অনুমান করে বললেন, তোর মেজাজটা আজ ভালো নেই দেখছি।

—ঠিকই ধরেছেন। খুব চিন্তায় আছি।

—কেন? কি হল?

—বলছি। আগে আপনার কথা শুনি।

বাচ্চুদা এবার একটা সিগারেট ধরিয়ে বললেন, তোর নামে ভয়ংকর অভিযোগ আছে।

ভোলা কিছু অনুমান না করতে পেরে জিজ্ঞেস করল, কি অভিযোগ?

বাচ্চুদা জিজ্ঞেস করলেন, তুই নাকি আজকাল এক বুর্জোয়ার বাড়ি যাতায়াত করছিস? সত্যি?

ভোলা অস্বীকার করল না। বলল, হ্যাঁ।

—তার কি চম্পা নামে একটি মেয়ে আছে?

—হ্যাঁ।

—তুই নাকি সেই মেয়েটার পিছন ঘুরঘুর করিস ?

—হ্যাঁ।

বাচ্চুদা একথায় উত্তেজিত হয়ে পড়লেন। বললেন, তোর একথা বলতে লজ্জা করল না ? তুই একজন বামপন্থী হয়ে, একজন প্রগতিশীল হয়ে শেষ পর্যন্ত একজন বুর্জোয়ার মেয়ে, মানে একজন চরম প্রতিক্রিয়াশীলের মেয়েকে ভালোবেসে ফেললি ! তোর একবার বিবেকে বাধল না !

ভোলা মাথা হেঁট করে বলল, চম্পা খুব ভালো মেয়ে বাচ্চুদা।

ভালো মেয়ে। বুর্জোয়ারা কখনও ভালো হয় ? তুই চম্পাকে ছেড়ে দে। আমি তোর জন্যে বাসন্তীকে ঠিক করে রেখেছি। কাল থেকে তুই বাসন্তীকে ভালোবাসবি।—বলেই বাসন্তীর দিকে তাকিয়ে বাচ্চুদা বললেন, বাসন্তী ! তুই কাল থেকে ভোলাকে ভালোবাসবি।

বাসন্তী বাচ্চুদাকে জিজ্ঞেস করল, কখন ভালোবাসব ?

—সন্ধেবেলা, অফিস ছুটির পর।

বাসন্তী তারপর একটু থেমে জানতে চাইল, ভালোবাসাটা কি দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে হবে ?

—নিশ্চয়। তুই কাল একবার 'ভালোবাসার দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি' বইটা পড়ে নিস। খুব ভালো বই। প্রগতিশীল প্রেমিক-প্রেমিকাদের জন্যে খুব সহজ ভাষায় লেখা।

ভোলা এই সময় বলল, কিন্তু বাচ্চুদা, আমার পক্ষে চম্পাকে ছাড়া আর কাউকে ভালোবাসা সম্ভব নয়।

বাচ্চুদা এবার প্রায় লাফিয়ে উঠলেন, সম্ভব নয়! আমি তোর ভালোর জন্যে বলছি, তুই চম্পাকে ভুলে যা। তুই কাল থেকে বাসন্তীকে ভালোবাসবি। তুই জেনে রাখিস, এ আমার নির্দেশ, মানে, পার্টির নির্দেশ। যদি এর বিরোধিতা করিস তাহলে তোর কপালে দুঃখ আছে। যা, এখন বাড়ি চলে যা।

ভোলার আর তর্ক করার সাহস হল না, উঠে দাঁড়াল। ভোলা জানে দলের বিরোধিতা যে করে তার ক্ষমা নেই, তাকে শুধু দল থেকে তাড়িয়েই দেওয়া হয় না, দরকার হলে তাকে মেরেও ফেলা হয়। ভোলা রাস্তায় পা দিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। না! চম্পা তার কপালে নেই। দক্ষিণপন্থী এবং বামপন্থী কেউই চায় না চম্পা তার হোক। কিন্তু চম্পার বদলে বাসন্তীকে

কিভাবে ভালোবাসা যায় ? বাচ্চুদা এটা কি করে বললেন ? বাসন্তী এক কথায় অসহ্য। ওর কথাবার্তা চালচলন কিছুই তার পছন্দ হয় না। তাই সে চিরকাল ওকে এড়িয়ে এসেছে। ভালো করে কোনদিন ওর সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলেনি। অথচ আজ···

এমন সময় ভোলা চমকে উঠল। পিছন থেকে বাসন্তীর গলা শুনল, ভোলা!

ভোলা দাঁড়িয়ে পড়ল। বাসন্তী ভোলার পাশে এসে বলল, কাল লাইট-হাউসের সামনে সাড়ে পাঁচটায় দাঁড়িয়ে থাকবে। ওখানেই আমাদের দেখা হবে।

—এটাও কি বাচ্চুদা ঠিক করে দিয়েছেন?

—হ্যাঁ।

৪

অফিসের কাজ সেরে লাইটহাউসের সামনে পোঁছতে ভোলার পাঁচটা পঁয়তাল্লিশ হয়ে গেল। সে দেখল বাসন্তী গম্ভীর মুখে দাঁড়িয়ে আছে। ভোলা ক্ষমা চাওয়ার জন্যে বাসন্তীর সামনে এসে দাঁড়াল। কিন্তু ক্ষমা চাওয়ার আগেই বাসন্তী জিজ্ঞেস করল, এত দেরি হল কেন?

ভোলা ঢোক গিলে বলল, অফিসে এমন কাজের চাপ ছিল যে···

বাসন্তী বলল, মিথ্যে কথা। চম্পার সঙ্গে নিশ্চয় তোমার দেখা হয়েছিল।

—বিশ্বাস কর, চম্পার সঙ্গে মোটেই আমার দেখা হয়নি।

—আবার মিথ্যে কথা। আমি তোমার বিরুদ্ধে বাচ্চুদার কাছে রিপোর্ট করব।

রিপোর্টের নামে ভোলা আঁতকে উঠল। বলল, তোমার পায় পড়ি, আর যাই কর, এ কাজটা করো না।

—এবারের মত ক্ষমা করলাম। এবার চলো, ময়দানে গিয়ে বসা যাক।

ভোলা প্রতিবাদ করল না। নিঃশব্দে বাসন্তীর সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে ময়দানে এসে একটা গাছের নীচে বসল।

বাসন্তী চিন্তিত মুখে বলল, প্রতিক্রিয়াশীলরা দিন দিন সক্রিয় হয়ে উঠছে। আমাদের আন্দোলনে ফাটল ধরাতে চাইছে। আমাদের এ ব্যাপারে সর্বদা সজাগ থাকতে হবে।

ভোলা জানতে চাইল, কি ভাবে?

—চম্পারা প্রতিক্রিয়াশীল। ওরা বুর্জোয়া। ওদের বিরুদ্ধেই আমাদের সংগ্রাম। সুতরাং চম্পা বা চম্পার মত কোন মেয়ের সঙ্গে একদম মিশবে না।

—শুধু তোমার সঙ্গে মিশব ?

বাসন্তী জোর দিয়ে বলল, হ্যাঁ, শুধু আমার সঙ্গে মিশবে।

—আমাদের কি কাজ হবে ?

—আমাদের কাজ হবে সমাজ থেকে সরে গিয়ে স্বপ্নের জাল তৈরি করা নয়, আমাদের কাজ হবে মেহনতি মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়ানো, তাদের সংগ্রামী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করা, শোষণহীন সমাজ নির্মাণের কাজ ত্বরান্বিত করা।

—এটাই কি বামপন্থী ভালোবাসার আদর্শ ?

—হ্যাঁ।

—তাহলে কি আমাদের মধ্যে আলিঙ্গন, চুম্বন চলবে না ?

—না। ওগুলো সম্পূর্ণভাবে বুর্জোয়া ভালোবাসার রীতিনীতি এবং প্রগতিশীল আন্দোলনের পক্ষে ক্ষতিকর।

—তাহলে আমরা এখানে বসে আছি কেন! আমাদের উচিত এখনই মেহনতি মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়ানো।

—কাল থেকে দাঁড়াব। আজ এখানে বসেছি আমাদের সংগ্রামী ভালো-বাসার কর্মসূচি তৈরি করার জন্যে।

—আমি ওসব পারব না।

পারব না বললে হবে না। তোমাকে পারতে হবে।—বলে একটু থেমে বাসন্তী বলল, কাল আমরা হাওড়ার একটা চটকলে যাব। সেখানে একমাস ধরে ধর্মঘট চলছে। আমরা সেখানে গিয়ে তাদের আন্দোলনকে আরও জোরদার করার চেষ্টা করব। তার পরের দিন যাব তারাতলায়, শ্রমিকদের মিটিংয়ে। সেখানে আমি বক্তৃতা দেব। তুমি আমার পাশে থাকবে। এভাবে আমরা শ্রমিকদের মধ্যে গিয়ে যত কাজ করতে পারব, আমাদের ভালোবাসা তত সার্থক হবে।

—আমরা বিয়ে করব না ?

—না। বিয়ে ব্যাপারটা অত্যন্ত প্রতিক্রিয়াশীল।

—কেন ?

—কারণ বিয়ে করলেই মানুষ স্বার্থপর হয়ে পড়ে। সে দলের কথা ভুলে গিয়ে, তার আদর্শের কথা ভুলে গিয়ে বুর্জোয়াদের মত ঘরসংসার সামলাতে

থাকে। তার পক্ষে তখন ঘরসংসার ফেলে শ্রমিকশ্রেণী বা কৃষকশ্রেণীর কথা ভাবা সম্ভব হয় না।

—বাচ্চুদা কি তাই বলেছেন?

—হ্যাঁ। তবে এসব কথা 'ভালোবাসার দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি' বইটাতেও লেখা আছে।

ভোলা এতক্ষণ যাবতীয় বিরক্তি গোপন করে সব শুনে যাচ্ছিল। এবার আর পারল না। বাড়ি যাওয়ার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। বলল, আজ এই পর্যন্ত থাক। কাল তো আবার দেখা হবে। তখন বাকি কথা শুনব।

বাসন্তী কিছু বুঝতে না পেরে সরলভাবে প্রশ্ন করল, আজ এখনি উঠবে?

—হ্যাঁ, এখনি উঠব। বাড়িতে একটু কাজ আছে।

৫

পরদিন ভোলা হাওড়ার চটকল শ্রমিকদের কাছে গেল না। বাসন্তীকে অসুস্থতার অজুহাত দেখিয়ে অফিস থেকে বাড়ি ফিরে এল। এসেই একটা চিঠি লিখল। চিঠিটা ভাইয়ের হাত দিয়ে চম্পার কাছে পাঠিয়ে দিল। চিঠিটা এইরকম :

কলকাতা

২/৪

প্রিয়তমাসু,

পার্টির নির্দেশে আমাকে গতকাল বাসন্তী নামে এক কট্টর প্রগতিশীল তরুণীর সহিত ময়দানে গিয়া বসিতে হইয়াছিল। সে এক মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা। আজও তাহার সহিত হাওড়ার চটকল শ্রমিকদের মিটিং-এ মিলিত হইবার কথা ছিল। কিন্তু আমি শারীরিক অসুস্থতার অজুহাত দেখাইয়া বাড়ি চলিয়া আসিয়াছি। ভবিষ্যতে পার্টির নির্দেশে তাহার সহিত আবার মিলিত হইব এমন বাসনাও নাই। কিন্তু পার্টির নির্দেশ অমান্য করিব এমন সাহসও নাই। আমি এখন বাসন্তীর হাত হইতে পরিত্রাণ চাই। অথচ পার্টি যদি জানিতে পারে আমি বাসন্তীকে পরিত্যাগ করিতে চাহিতেছি তাহা হইলে আমার ধড়ে মুণ্ডু থাকিবে না। তুমি এখন সুপরামর্শ দিয়া আমাকে এই বিপদ হইতে রক্ষা কর। ইতি

তোমার ভোলা

রাত্রিবেলা ভাই খালি হাতে ফিরল না। সেও চম্পার একটা চিঠি নিয়ে বাড়ি এল। চিঠিটা এইরকম :

কলকাতা

২/৪

প্রিয়তমেষু,

তোমার চিঠি পড়িয়া সবই বুঝিতে পারিলাম। কিন্তু আমি কি সুপরামর্শ দিয়া তোমাকে এই বিপদ হইতে রক্ষা করিব তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। কারণ আমার বিপদও কম নয়। বাবা আমার জন্যে কোথা হইতে এক বামপন্থী নেতার দক্ষিণপন্থী ছেলে ধরিয়া আনিয়াছেন তাহা জানি না। ছেলেটি দেখিতে শুনিতে মন্দ নয়, কিন্তু একেবারেই হাবাগোবা। সে প্রথমদিনেই আমাকে কীটস, শেলী, রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দের কবিতা শুনাইয়াছে। যতবার তাহাকে বলিতেছি, প্রেম করিতে গেলে আজকাল এসব চলে না, এ পদ্ধতি একেবারে বাতিল হইয়া গিয়াছে, তবুও ছেলেটি নাছোড়বান্দা। আমি কবিতা শুনিব না, অথচ সে আমাকে কবিতা শুনাইবেই, তখন নিরুপায় হইয়া তাহার কাব্যরোগ ছাড়াইবার জন্য এই দুপুরের চড়া রোদে তাহাকে কলেজ স্ট্রীট হইতে শ্যামবাজার পর্যন্ত হাঁটাইয়া লইয়া গেলাম। কিন্তু তাহার কাব্যরোগ ছাড়িল না। তখন বিরক্ত হইয়া তাহাকে বলিলাম, তুমি এখন বাড়ি গিয়ে লেবুর সরবৎ খাও। সে বাড়ি গিয়া লেবুর সরবৎ খাইয়াছিল কিনা তাহা জানি না, তবে আমি ভাবিয়াছিলাম আমার ওপর ক্রুদ্ধ হইয়া সে আর পরের দিন আমার কাছে আসিবে না। কিন্তু সমস্ত ভাবনা ব্যর্থ করিয়া পরের দিন সে আবার আমার কাছে আসিয়াছে, অথচ কাব্যরোগের তিলমাত্র উপশম হয় নাই। তখন আমি তাহাকে নিরস্ত করিবার জন্য তোমার কথা বলিলাম এবং আরও বলিলাম আমাকে লাভ করিতে হইলে তোমার সহিত তাহাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে হইবে। আগামীকাল বাবা বাড়িতে থাকিবেন না। অতএব তুমি আগামীকাল অফিস ছুটির পর আমাদের বাড়িতে আসিবে এবং উহাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে পরাস্ত করিয়া আমাকে উহার হাত হইতে নিষ্কৃতি দিবে। ইতি

তোমার চম্পা

৬

পরদিনও অসুস্থতার অজুহাত দেখিয়ে ভোলা তারাতলায় গেল না।

অফিস ছুটির পর চম্পার বাড়ি গিয়ে হাজির হল। ভিতরে ঢুকে দেখল বসার ঘরে আর একজন বসে আছে। তার মুখের দিকে তাকিয়ে ভোলা আতঙ্কিত হল। এ যে জয়ন্ত! বাচ্চুদার ছেলে! ও এখানে কেন? ও কি সেই বামপন্থী নেতার দক্ষিণপন্থী পুত্র! তাকে কি এখন এর সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হবে! এ তো অসম্ভব ব্যাপার।

ভোলা হেসে জিজ্ঞেস করল, আপনি এখানে?

জয়ন্তও হেসে বলল, আমারও সেই এক প্রশ্ন: আপনি এখানে? আপনার তো আজ বাসন্তীকে নিয়ে তারাতলা যাবার কথা ছিল।

চম্পা অবাক হয়ে বলল, তোমরা তাহলে পরস্পরকে চেন!

ভোলা বলল, অনেক দিন থেকে। উনি যে বাচ্চুদার ছেলে।

চম্পা তখন বলল, তাহলে লড়াইটা ভালোই জমবে দেখছি। চলো, ছাদে চলো। ওখানেই তোমাদের লড়াইয়ের ব্যবস্থা করেছি।

এবার ভোলার মাথার ভিতর ভোঁ ভোঁ করতে লাগল। সে স্বপ্নেও ভাবেনি তাকে আজ মন্ত্রীপুত্র জয়ন্তর সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হবে। যদি ভাবত তাহলে সে এখানে আসত না। সে জানে মন্ত্রীপুত্রের সঙ্গে শুধু এই লড়াইতে নয়, কোন লড়াইতেই জিততে পারবে না। তাকে সবসময় হারতে হবে। না হারলে রক্ষে নেই। আজকের লড়াইতেও তাকে হারতে হবে। কারণ আজ যদি সে জিতে যায় তাহলে কথাটা বাচ্চুদার কানে উঠবে, আর তখন বাচ্চুদা তাকে আস্ত রাখবেন না। তাকে শুধু পার্টি থেকে তাড়িয়ে দিয়েই ক্ষান্ত হবেন না, তাকে পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিতেও পারেন। অতএব মিছিমিছি লড়াইতে না গিয়ে আগেভাগে হার স্বীকার করে নেওয়াই ভালো। তাতে সে অন্তত প্রাণে রক্ষা পাবে। অতএব চম্পার দিকে আর হাত বাড়িয়ে কাজ নেই, চম্পা আজ থেকে জয়ন্তরই হোক।

ভোলা বলল, আমাকে ছেড়ে দাও। আমি লড়াই করব না।

চম্পা বলল, তার মানে তুমি হার স্বীকার করছ?

ভোলা বলল, হ্যাঁ।

জয়ন্ত তখন চম্পাকে বলল, আমি তোমাকে তো একটু আগেই বলেছিলাম, আমি মন্ত্রীপুত্র, আমার সঙ্গে কেউ লড়াইতে পারবে না। কিন্তু আমি কবিতা আওড়াই বলে তুমি আমার কথা বিশ্বাস করনি। এখন দেখলে তো!

চম্পা গম্ভীর মুখে বলল, তাই তো দেখছি।

ভোলা একটা কথা বলল না। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

চম্পা এবার ভোলার উদ্দেশে বলল, তুমি তাহলে এখন এস। বাসন্তী তোমার জন্যে তারাতলায় অপেক্ষা করছে। তুমি বাসন্তীর কাছেই যাও।

ভোলা সমস্ত অপমান সহ্য করে চম্পাদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল। ক্ষোভে দুঃখে তার শরীর কাঁপতে লাগল। হ্যাঁ, সে এখনই তারাতলায় যাবে। বাসন্তীর হাত ধরে ঘুরে বেড়াবে। কিন্তু মনের দুঃখে সে শেষ পর্যন্ত আর তারাতলায় গেল না, বাড়ি ফিরে এল। তবে ঠিক করল সে কাল থেকে নিয়মিত বাসন্তীর কাছেই যাবে। তাকে মনে রাখতে হবে তার ভাইয়ের এখনও চাকরি হয়নি, তার বাবা এখনও পেনশন পাননি। অতএব চম্পার জন্যে দলের নির্দেশ উপেক্ষা করে বাসন্তীকে পরিত্যাগ করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। চম্পাকে সে হারিয়েছে, কিন্তু বাসন্তীকে হারালে চলবে না। এখন তার বাসন্তী-কেই চাই।

কিন্তু পরদিন অফিস যাবার মুখে ভোলাকে একজন একটা চিঠি দিয়ে গেল। চিঠিতে লেখা : পার্টির শৃঙ্খলাভঙ্গের দায়ে আপনাকে পার্টি হইতে সর্বসম্মতিক্রমে বহিষ্কার করা হইল। আপনার সহিত পার্টির আর এখন হইতে কোন সম্পর্ক রহিল না।

বেকার-কাহিনী

সম্প্রতি সরকার একটি আইন জারি করেছে। আইনটা এইরকম : দেশের মধ্যে আর একজনও বেকার নেই। তাই এখন থেকে কেউ আর নিজেকে বেকার বলে পরিচয় দিতে পারবে না। যদি কেউ এই নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করে নিজেকে বেকার বলে পরিচয় দেয় তাহলে তার দশ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে পাঁচ বছর সশ্রম কারাদণ্ড হবে। কানু এই আইনের কথা জানত। কিন্তু তা সত্ত্বেও সে খবরের কাগজে একটা চিঠি দিয়ে বসল। চিঠিটা এইরকম :

আমি দশ বছর হল এম এ পাশ করেছি। এই দশ বছর আমি প্রায় দশ হাজার জায়গায় দরখাস্ত করেছি। অথচ আজো চাকরি পাওয়া দূরে থাক একটা ইন্টারভিউ লেটার পর্যন্ত পাইনি। আমি এখনো বেকার। সরকারের কাছে আমার জিজ্ঞাসা, আমি এখন কি করব ?

এই চিঠি খবরের কাগজে যথারীতি ছাপা হল, এবং ছাপা হবার পরদিনই বাড়িতে পুলিশ এসে হাজির হল।

কানু পুলিশ দেখেই একটু ভীত হয়ে পড়ল। জিজ্ঞেস করল, কি ব্যাপার ?

পুলিশ এ প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে জানতে চাইল, আপনার নাম ?

—কানু বসাক।

—আপনাকে অ্যারেস্ট করা হল।

—আমার অপরাধ ?

—আপনি খবরের কাগজে চিঠি লিখেছিলেন ?

—হ্যাঁ।

—সে চিঠিতে নিজেকে বেকার বলে পরিচয় দিয়েছেন ?

—হ্যাঁ। কারণ আমি বেকার। আপনি বিশ্বাস করুন…

—বাজে কথা। আমাদের দেশে এখন কোন বেকার নেই।

—বেকার নেই। তাহলে আমি কি ?

—আপনি কি তা আপনিই জানেন। আপনি এখন থানায় চলুন।

—ওয়ারেন্ট এনেছেন ?

—ওয়ারেন্ট। ওয়ারেন্ট দিয়ে কি হবে ?

—আপনি ওয়ারেন্ট ছাড়াই...

—হ্যাঁ। ওয়ারেন্ট ছাড়াই আপনাকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে।

কানু দেখল কোন উপায় নেই। এই লোকটার সঙ্গে তর্ক করা বৃথা সে তাই আর কথা না বাড়িয়ে নিঃশব্দে পুলিশ ভ্যানে গিয়ে উঠে বসল।

২

পুলিশ হাজতে কানু ছাড়া আরো দুজন ছিল। তাদেরও ঐ এক অপরাধ। তারাও নিজেদের বেকার বলে পরিচয় দিয়েছিল। তাদের একজনের নাম বাচ্চু, আর একজনের নাম টিকু।

বাচ্চু তার বন্ধু তপন দাশকে একটা পোস্টকার্ডে লিখেছিল :

বন্ধুবরেষু,

গতকাল তোর চিঠি পেয়েছি। তাতে জানলাম তুই একটা ভালো চাকরি পেয়েছিস। এতে আমি খুব আনন্দিত। কিন্তু দুঃখ এই যে আমি আজও চাকরি পাইনি। দরখাস্ত করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। আর দরখাস্ত করতে ভালো লাগে না। তোদের অফিসে যদি কখনো লোক নেয় তাহলে আমার জন্যে একটু সুপারিশ করিস। অধিক কি? আমার ভালোবাসা নিস। ইতি

বাচ্চু

বাচ্চুর এই চিঠিটা প্রথমে পিয়নের চোখে পড়ে। পিয়ন তখন এই চিঠিটা তপনকে না দিয়ে তাদের ইউনিয়নের নেতার হাতে তুলে দেয়। ইউনিয়নের নেতা তখন চিঠিটা স্থানীয় থানার ও সি-র হাতে তুলে দেয়। ও সি তখন চিঠিটা পড়ে ক্ষিপ্ত হয়ে বাচ্চুকে গ্রেপ্তার করে হাজতে ভরে।

টিকু অবশ্য বাচ্চুর মত কাউকে চিঠি লিখতে গিয়ে ধরা পড়েনি। টিকু একটা কোম্পানিতে কাজ করত। তিন বছর সেখানে কাজ করার পর সে বেকার হয়ে পড়ে। কারণ কোম্পানির মালিক লকআউট ঘোষণা করে। টিকুর আশা ছিল কয়েক মাস পরে মালিক লকআউট তুলে নেবে। কিন্তু দেখতে দেখতে পাঁচ বছর হয়ে গেল, অথচ কোম্পানি খোলার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। সে তখন নতুন করে চাকরি খুঁজতে শুরু করে। আর তখনই সরকার আইন জারি করল : দেশের মধ্যে আর একজনও বেকার নেই। তাই এখন থেকে কেউ আর নিজেকে বেকার পরিচয় দিতে পারবেন না। যদি

কেউ এই নিষেধাজ্ঞা…ইত্যাদি ইত্যাদি। টিকু এই সরকারি নির্দেশের কথা জানতে পেরেই ভীষণ বিচলিত হয়ে পড়ে। তার চোখ থেকে ঘুম চলে যায়। বুঝে উঠতে পারে না সে এখন কি করবে। সে একবার ভাবে চুরি করে পেট চালাবে, আর একবার ভাবে ডাকাতি করে পেট চালাবে। কিন্তু চুরি করা বা ডাকাতি করার মত মনের বল না থাকায় সে শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যার রাস্তাটাই বেছে নেয়। আর তারপরই সে হাঁটতে হাঁটতে রেলস্টেশনে আসে, রেললাইন ধরে হাঁটতে থাকে। হাঁটতে হাঁটতে দূরে থেকে ছুটে আসা একটা ট্রেন দেখতে পেয়ে লাইনের ওপর শুয়ে পড়ে। টিকুর দুর্ভাগ্য ট্রেনের ড্রাইভার তা দেখতে পায় এবং ট্রেন থামিয়ে দেয়। ট্রেন থামার সঙ্গে সঙ্গে ট্রেন থেকে অনেক লোক নেমে আসে, টিকুকে ঘিরে ধরে। তারপর তাকে ঐ একই থানায় নিয়ে আসে। কারণ এই এলাকা ঐ থানার অন্তর্ভুক্ত ছিল। থানার ও সি টিকুকে জিজ্ঞেস করেন, আপনার নাম ?

টিকু উত্তরে তার নাম বলে।

ও সি তখন তাকে জিজ্ঞেস করেন, আপনি কি করেন ?

টিকু বলে, আমি বেকার।

ও সির চোখ কপালে ওঠে, বেকার !

—হ্যাঁ, বেকার।

—কিন্তু দেশে তো এখন বেকার থাকার কথা নয়।

—অথচ আমি বেকার।

তাহলে আপনাকে গ্রেপ্তার করা উচিত।—বলে দ্বিধা না করে থানার ও সি টিকুকে পুলিশ হাজতে পুরে দেন।

৩

কানু, বাচ্চু ও টিকুর বাড়ি একই থানার অধীনে থাকলেও তাদের মধ্যে কোন জানাশোনা ছিল না। কেউ কাউকে কোনদিন দেখেনি পর্যন্ত। এই পুলিশ হাজতের মধ্যেই তাদের পরস্পরের সঙ্গে পরিচয় হল। তারা জানল তারা একই অপরাধে অপরাধী, তারা সকলেই বেকার। এটা কানু জানার পর বাচ্চু ও টিকুকে জিজ্ঞেস করল, আপনাদের জামিন হওয়ার কেউ নেই ?

বাচ্চু বলল, আমি মামার বাড়িতে থাকি। আমাকে এখান থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার কোন আগ্রহ মামার নেই। থাকলে মামা একবার আসত।

টিকু বলল, আমরা সাত ভাই। আমরা কেউ কারো খোঁজ রাখি না। আমি এক ভাইয়ের কাছে থাকি। আমার কোম্পানিতে লকআউট হবার পর থেকে ভাই আমাকে রোজ বাড়ি থেকে চলে যেতে বলত। এখন তো সে বেঁচে গেল। সে কোনদিন আমার জামিনের চেষ্টা করবে না।

কানু বলল, আমারো আপনাদের মত অবস্থা। আমার জন্যেও কেউ আসবে না।

বাচ্চু জিজ্ঞেস করল, কেন? আপনার বাবা নেই?

—আছে।

—তাহলে?

—আমার নিজের মা নেই, সৎমা আছে। সৎমা বাবাকে আসতে দেবে না।

—কেন?

—আমি মরলে সৎমা বাঁচে।

টিকু তখন কানুকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, আপনি ভাববেন না। আপনার বাবা ঠিক আসবেন। আপনাকে এখান থেকে তিনি ছাড়িয়ে নিয়ে যাবেন।

বাচ্চু বলল, আমারো তাই মনে হয়।

কানু বলল, আসবে না, বাবা আসবে না।

টিকু বলল, আসবেন।

বাচ্চু বলল, ঠিক আসবেন। না এসে পারবেন না।

কিন্তু কানুর বাবা এলেন না।

৪

হাজতের নোংরা পরিবেশে আরো সাতদিন কানু, বাচ্চু ও টিকু কাটিয়ে দিল। এই সাতদিনের মধ্যে পাঁচজন খুনী, দশজন চোর, পনেরজন পকেটমার তাদের ঘরে ঢুকল এবং প্রত্যেকেই কয়েক ঘণ্টা পর জামিনে ছাড়া পেল। কানু, বাচ্চু ও টিকু ওদের চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে কেবল দীর্ঘশ্বাস ফেলল। আর ভাবতে লাগল তারা যদি বেকার না হয়ে খুনী, চোর বা পকেটমার হত তাহলে তারা বেঁচে যেত। এইভাবে তারা দিনের পর দিন হাজতের মধ্যে আটকে থাকত না। কেউ না কেউ এসে তাদের ঠিক ছাড়িয়ে নিয়ে যেত। তারা রাত্রির অন্ধকারে শুয়ে শুয়ে নিজেদের মধ্যে এই সব কথা বলাবলি করতে

—আমি আর এক মুহূর্ত এখানে থাকতে পারছি না।

—আমার সারাদিন গা বমি বমি করে।

—আমি ঘুমোতে পারি না।

—এই ঘর কি নোংরা!

—খাবার কি নোংরা!

—মানুষ এখানে কি করে থাকে!

—আমরা এখানে কি করে আছি!

—কবে যে এখান থেকে ছাড়া পাব!

—কবে যে বিচার হবে!

—হলেই বা কি! তারপর তো জেল।

—এই নোংরা ঘরে তো আর থাকতে হবে না।

—ঠিক, হাজতের থেকে জেল ভালো।

—হয়ত ভালো।

—হয়ত খারাপ।

—যতই খারাপ হোক, এর থেকে খারাপ হবে না।

—দেখা যাক।

—জেলে গেলে আমাদের আর একটা অভিজ্ঞতা হবে।

—এ অভিজ্ঞতার দরকার ছিল না।

—কেন যে এম-এ পাশ করলাম।

—কেন যে বি এ পাশ করলাম।

—কেন যে কোম্পানিতে লকআউট হল।

—কার দোষ?

—কার?

—কপালের।

—হয়ত।

৫

প্রায় একমাস পরে কানু, বাচ্চু ও টিকুকে আদালতে নিয়ে যাওয়া হল। তাদের বিচার শুরু হল। প্রথমে কাঠগোড়ায় উঠে দাঁড়াল কানু। সরকার

পক্ষের উকিল তাকে একের পর এক প্রশ্ন করতে লাগলেন। কানু তার উত্তর দিতে লাগল। আর বিচারক চুপ করে সব শুনতে লাগলেন।

উকিল প্রশ্ন করলেন, আপনার নাম?

কানু নাম বলল।

—আপনার ঠিকানা?

কানু ঠিকানা বলল।

—বাড়িতে আপনার কে কে আছে?

কানু এর উত্তর দিল।

—আপনি কতদূর লেখাপড়া করেছেন?

কানু তা বলল।

—আপনি রোজ কি টুথপেস্ট ব্যবহার করেন?

কানু টুথপেস্টের নাম বলল।

—আপনি কি সাবান ব্যবহার করেন?

কানু সাবানের নাম বলল।

—আপনি রোজ কোন খবরের কাগজ পড়েন?

কানু খবরের কাগজের নাম বলল।

—আপনি কি সে কাগজে একটা চিঠি দিয়েছিলেন?

—হ্যাঁ।

—চিঠিটা বল পেনে না ফাউন্টেন পেনে লিখেছিলেন?

—বল পেনে।

—চিঠিতে কি লিখেছিলেন?

—সব মনে নেই।

—যা মনে আছে বলুন।

—মনে আছে চিঠিতে লিখেছিলাম, আমি এখনো বেকার। সরকারের কাছে আমার জিজ্ঞাসা, আমি এখন কি করব?

উকিল এবার বিচারকের দিকে তাকিয়ে বললেন, মি লর্ড, আপনি শুনলেন আসামী নিজের মুখে স্বীকার করছে সে নিজেকে বেকার বলে পরিচয় দিয়েছিল। এবার আপনি এর বিচার করুন।

বিচারক বিচার করে রায় দিলেন, দশ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে পাঁচ বছর সশ্রম কারাদণ্ড।

কানুর জন্যে দশ হাজার টাকা দূরে থাক, কেউ এক পয়সা নিয়েও দাঁড়িয়ে ছিল না। অতএব তার জন্যে পাঁচ বছর সশ্রম কারাদণ্ডের ব্যবস্থা হল।

কানুর বিচারের পর বাচ্চুকে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হল।

উকিল জিজ্ঞেস করলেন, আপনার নাম?

বাচ্চু নাম বলল।

—আপনার ঠিকানা?

বাচ্চু ঠিকানা বলল।

—আপনি কি হিন্দি সিনেমা দেখেন?

—দেখি।

—আপনার প্রিয় নায়িকা কে?

—রেখা।

—প্রিয় নায়ক?

—অমিতাভ বচ্চন।

—প্রিয় সুরকার।

—রাহুলদেব বর্মন।

—আপনার প্রিয় বন্ধু কে?

—তপন দাশ।

—আপনি কি তপন দাশকে কোন চিঠি দিয়েছিলেন?

—দিয়েছিলাম।

—খামে না পোস্টকার্ডে?

—পোস্টকার্ডে।

—পোস্টকার্ডে তাকে কি লিখেছিলেন?

—তাকে লিখেছিলাম, আমি আজও চাকরি পাইনি। সে যদি তার অফিসে আমার জন্যে একটা চাকরি করে দিতে পারে তাহলে খুব ভালো হয়।

—অর্থাৎ আপনি জানিয়েছিলেন আপনি বেকার?

—হ্যাঁ।

—আপনি কি জানেন নিজেকে বেকার বলে পরিচয় দেওয়ার কি শাস্তি?

—জানি।

—তাহলে লিখেছিলেন কেন?

—নিরুপায় হয়ে।

—যে দেশে একজনও বেকার নেই, যে দেশে নিজেকে বেকার বলে পরিচয় দেওয়া লজ্জার, যে দেশে বেকার থাকা আইনত দণ্ডনীয়, সে দেশে কি করে নিজেকে বেকার বলে উল্লেখ করলেন ? আপনার ভয় করল না ?

—কিসের ভয় ? আমি তো সত্যিই বেকার।

উকিল তখন বিচারকের দিকে তাকিয়ে বললেন, মি লর্ড, আপনি স্বকর্ণে এর কথা শুনলেন। আপনি দেখুন মানুষ কতখানি রাষ্ট্রদ্রোহী হলে এভাবে কথা বলতে পারে। আপনি এর যোগ্য বিচার করুন।

বিচারপতি বিচার করে রায় দিলেন দশ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে পাঁচ বছর সশ্রম কারাদণ্ড।

বাচ্চুর হয়ে জরিমানা দেবারও কেউ ছিল না। অতএব তার জন্যেও কানুর মতই পাঁচ বছর সশ্রম কারাদণ্ডের ব্যবস্থা হল।

বাচ্চুর পর টিকু কাঠগড়ায় উঠে দাঁড়াল। উকিল তাকে ওদের মতই নানা প্রশ্ন করলেন। এবং বিচারকও তাকে ঐ একই শাস্তি দিলেন।

৬

পাঁচ বছর সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করার পর একদিন সকাল দশটায় কানু, বাচ্চু ও টিকু জেলখানা থেকে বেরিয়ে এল। বেরিয়ে এসে তারা নতুন এক সমস্যায় পড়ে গেল। তারা এখন কি করবে ? তারা তো এখনো বেকার। তারা তখন ঠিক করল আপাতত তারা যে যার বাড়ি ফিরে যাবে। কিন্তু বাড়িতে যদি তাদের জায়গা না হয় ? যদি বেকার বলে তাদের তাড়িয়ে দেওয়া হয় ? সরকারের কাছে যারা অপরাধী তাদের কে আদর করে বাড়িতে রাখবে। তাই অনেক আলাপ আলোচনার পর তারা ঠিক করল যদি বাড়িতে তাদের ঠাঁই না হয় তাহলে তারা এসপ্লানেড ইস্ট-এ মিলিত হবে এবং সেখানে চাকরির দাবিতে অবস্থান করবে। এতে যদি তাদের আবার জেল হয়, হোক। সিদ্ধান্তে আসার পর তারা প্রত্যেকে প্রত্যেকের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল।

কানুর আশা ছিল পাঁচ বছর পর বাবা তাকে দেখে খুশি হবে। কিন্তু বাবা খুশি হল না। আর সৎমাও তাকে দেখে প্রায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। ফলে সেদিনটুকু কোনরকমে বাড়িতে থেকে পরদিন সকালে আবার সে বাড়ি ছেড়ে বেরল। বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এসপ্লানেড ইস্ট-এ এসে পৌঁছল। সেখানে

বাচ্চু বা টিকুকে দেখতে পেল না। না পেয়ে সে একা কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। তারপর এদিক সেদিক ঘুরল। কোথাও যদি ওরা থেকে থাকে। না, কোথাও ওরা নেই। ওদের কি তাহলে বাড়িতে জায়গা হয়েছে! হলে ভালোই। এর জন্যে দুঃখ করার কিছু নেই। বরঞ্চ তার খুশি হওয়া উচিত। তবু কানু খুশি হতে পারল না। হতাশ হয়ে ফুটপাতে ধুলোর উপরে বসে পড়ল। তারপর ঠিক করল আরো কয়েক ঘণ্টা সে অপেক্ষা করবে। তখনো যদি বাচ্চু বা টিকু কেউ না আসে তাহলে সে একা-একা এখানে বসে থাকবে না। যেদিকে দুচোখ যায় চলে যাবে।

কিন্তু একটু পরে কানু আনন্দে লাফ দিয়ে উঠল। বাচ্চু না! হ্যাঁ, বাচ্চু ধীরে ধীরে তার দিকে এগিয়ে আসছে। কানু আর অপেক্ষা করতে পারল না। সে প্রায় ছুটে গিয়ে বাচ্চুকে জড়িয়ে ধরল। বাচ্চুও কানুকে পেয়ে খুব খুশি হল।

কানু বলল, আমি খুব ভয়ে ছিলাম। ভাবছিলাম কেউ হয়ত আসবে না।

বাচ্চু বলল, আমারো খুব ভয় ছিল। ভাবছিলাম, গিয়ে হয়ত কাউকে দেখতে পাব না।

কানু বলল, এখন টিকু এলেই হয়।

বাচ্চু বলল, টিকু ঠিক আসবে।

সত্যি, আধ ঘণ্টা পরে টিকু এসে হাজির হল। তারপর তারা তিনজনে হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে বসে গেল। তিনটে প্ল্যাকার্ডেই এক কথা: আমরা বেকার। আমাদের চাকরি দাও।

৭

দেখতে-দেখতে কানু, বাচ্চু ও টিকুর কথা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। খবরের কাগজে তাদের ছবি ছাপা হল, সাক্ষাৎকার ছাপা হল। সরকার থেকে লোক এসে তাদের শাসিয়ে গেল। পুলিশ এসে তাদের আবার জেলে ভরবে বলে ভয় দেখাল। কিন্তু তারা অনড় হয়ে হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে রাস্তায় বসে রইল। আর তার ফল হল মারাত্মক। দেশের চারদিকে যত বেকার আত্মগোপন করে ছিল তারা সকলে সাহস পেয়ে দলে দলে এসপ্ল্যানেড ইস্ট-এ এসে ভিড় করতে লাগল। কানু, বাচ্চু ও টিকুর সঙ্গে তারাও প্রত্যেকে একটা প্ল্যাকার্ড হাতে নিয়ে রাস্তায় বসে গেল। তাদের সকলের প্ল্যাকার্ডে

একই কথা লেখা : আমরা বেকার। আমাদের চাকরি দাও। আর কাগজে তাদের নিয়ে নানা খবর ছাপা হতে লাগল। হিসেব করে লেখা হতে লাগল রোজ কত বেকার এসে এখানে যোগ দিচ্ছে। সেই হিসেব অনুযায়ী দেখা গেল গড়ে একশজন বেকার রোজ এই সমাবেশে যোগ দিচ্ছে। এবং এভাবে যোগ দেওয়ার ফলে এমন একদিন এল যখন গোটা এসপ্লানেড ইস্ট বেকারে ভরে গেল। সবাই এই বিপুল বেকার সমাবেশের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠল। অবাক হয়ে ভাবতে লাগল এত বেকার এল কোত্থেকে। অথচ সরকারি হিসেব অনুযায়ী দেশের মধ্যে একজন বেকারও থাকার কথা নয়। সরকার তাহলে কি এতকাল মিথ্যে কথা বলে এসেছে। খবরের কাগজ এ নিয়ে রীতিমত সোচ্চার হয়ে উঠল। সরকারের তীব্র সমালোচনা শুরু করে দিল। পাশাপাশি মন্ত্রীদের দুর্নীতির নানা কথা ফলাও করে লেখা হতে লাগল। সেসব লেখা থেকে জানা গেল এক মন্ত্রীর ছেলে পাঁচ বছরে তিরিশ কোটি টাকার সম্পত্তি করেছে, আর এক মন্ত্রী সুইস ব্যাংকে কোটি কোটি টাকা জমিয়েছে, অন্য এক মন্ত্রী তার অযোগ্য আত্মীয়স্বজনদের বিভিন্ন সরকারি উচ্চপদে বসিয়েছে, আবার কোন এক মন্ত্রী নাকি ঘুষ খেয়ে সরকারি ফ্ল্যাট বেচছে, জমি বেচছে, নানা লাইসেন্স পাইয়ে দিচ্ছে।

৮

সরকার খুব দুশ্চিন্তায় পড়ে গেল। সরকার আইন জারি করেছিল, যে নিজেকে বেকার বলে পরিচয় দেবে তার দশ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে পাঁচ বছর সশ্রম কারাদণ্ড হবে। কিন্তু এই হাজার হাজার বেকারকে কিভাবে জেলে ভরা যায়! দেশের মধ্যে এত জেলখানা কোথায়?

সরকার মাথায় হাত দিয়ে ভাবতে বসল। ভাবতে বসল এখন এই বিপদ থেকে কিভাবে উদ্ধার পাওয়া যায়। কারণ এভাবে আরো কিছুদিন চললে সরকারের ওপর জনগণ শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলবে। দেশের মধ্যে তীব্র আন্দোলন শুরু হবে। শত্রুপক্ষের লোকেরা বিদেশী শক্তির সাহায্যে সরকারকে উৎখাত করার চেষ্টা করবে। আর তাতে তারা সফল হতে পারে। ফলে কয়েকজন মন্ত্রী শেষ পর্যন্ত এক গুপ্ত বৈঠকে বসলেন। তাঁদের মধ্যে এইরকম কথাবার্তা হল :

—আমাদের আজ ভীষণ বিপদ।

—ভীষণ বিপদ।

—এখনি একটা কিছু করা দরকার।

—এদের খতম করলে কেমন হয়?

—খুব ভালো হয়। আপনাদের কি মত?

—আমার মতে এদের খতমই করা হোক।

—আমারো তাই মত। কারো আপত্তি আছে?

—না, না, কারো আপত্তি নেই। কারণ কাগজ যেভাবে এদের···

—কাগজগুলো খুব বেড়েছে।

—রোজ আমাদের নামে যা তা লিখছে।

—যা তা বলে যা তা। আমার ছেলে নাকি পাঁচ বছরে তিরিশ কোটি টাকার সম্পত্তি করেছে। যদি করেই থাকে বেশ করেছে। তোদের তাতে কি?

—হিংসে, স্রেফ হিংসে। নইলে বলে কিনা সুইস ব্যাংকে আমার নাকি কোটি কোটি টাকা আছে। আছে মাত্র পঁচিশ কোটি টাকা। সেটা কোটি কোটি টাকা হয়ে গেল!

—আসলে আমরা একটু খেয়ে পরে ভালোভাবে আছি, সেটা কাগজওয়ালাদের সহ্য হচ্ছে না। এই তো সেদিন কাগজে আমার নামে কিসব যাচ্ছেতাই কথা লিখল। আমি নাকি আমার অযোগ্য আত্মীয়স্বজনদের বিভিন্ন সরকারি উচ্চপদে বসিয়েছি। আরে! আমি বসাবার কে? তারা সকলে যোগ্যতায় ওখানে বসেছে। আপনারা তো সবই জানেন।

—জেনে কি করব? সব এখন হজম করতে হবে। এই যে গতকাল কাগজে লিখল আমি নাকি ঘুষ খেয়ে সরকারি ফ্ল্যাট বেচছি, জমি বেচছি, নানা লোককে নানা লাইসেন্স পাইয়ে দিচ্ছি—এসব কি সত্যি? আপনারাই বলুন। আর যদি ঘুষ খেয়েই থাকি, বেশ করেছি। যা করবার থাকে করুক।

—সবই কপাল। দেশের জন্যে এত করেও শেষ পর্যন্ত চোর বদনাম নিতে হল।

—কি বিচ্ছিরি ব্যাপার!

—দিব্যি ছিলাম। কোত্থেকে এই হাড়হাভাতে বেকারগুলো এসে···

—ওরাই সব গোলমালের মূলে।

—এখনই ওদের খতম করা দরকার।

—ওরা প্রতিক্রিয়াশীল।

—ওরা প্রতিবিপ্লবী।

—ওরা বিদেশের চর।

৯

দু'দিন পরে এসপ্লানেড ইস্ট-এ রাত দেড়টার সময় যখন কেউ কেউ ঘুমোচ্ছিল, কেউ কেউ গল্প করছিল, কেউ কেউ গান গাইছিল, কেউ কেউ কবিতা আবৃত্তি করছিল, তখন কোত্থেকে একটা ঢ্যাঙা লোক এল। তার গায় হলুদ শার্ট, পরনে নীল প্যান্ট, মাথায় লাল টুপি। তার হাতে ছিল একটা বাঁশি। সে সকলকে ডেকে বলল, ভাই সব! একটা সুখবর দিতে এলাম। সরকার আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে আপনাদের জন্যে চাকরির ব্যবস্থা করেছে। আপনারা যাঁরা সেখানে যেতে ইচ্ছুক তাঁরা আমার সঙ্গে আসুন।

সঙ্গে সঙ্গে যারা ঘুমোচ্ছিল তাদের জাগিয়ে দেওয়া হল। আর যারা গল্প করছিল, গান গাইছিল, কবিতা আবৃত্তি করছিল তারা স্তব্ধ হয়ে গেল। কয়েক মুহূর্তের জন্যে কারো মুখ দিয়ে কোন কথা বেরল না। তারা বুঝতে পারল না তাদের এখন কি করা উচিত। তবে কিছুক্ষণের মধ্যে তাদের এই হতচকিত অবস্থা কেটে গেল। তারা সকলেই উঠে দাঁড়াল। ঠিক করল এখানে দিনের পর দিন বসে থাকার চেয়ে লোকটাকে অনুসরণ করাই উচিত। তারা তার জন্যে প্রস্তুত হল।

লোকটা তখন হ্যামলিনের বাঁশিওয়ালার মত বাঁশি বাজিয়ে এ রাস্তা সে রাস্তা ধরে হাঁটতে লাগল। আর তার পিছনে পিছনে মন্ত্রমুগ্ধের মত আসতে লাগল হাজার হাজার বেকার।

বাঁশিওয়ালা বেকারদের হাঁটাতে হাঁটাতে খিদিরপুর ডকে নিয়ে এল। সেখানে একটা জাহাজ দাঁড়িয়েছিল। বাঁশিওয়ালা বাঁশি বাজাতে বাজাতে সেই জাহাজে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে সব বেকারদেরও সে জাহাজে তুলল। তারপর জাহাজ ছেড়ে ছিল। কিন্তু বাঁশিওয়ালাকে আর দেখা গেল না। শুধু তাই নয়, জাহাজটাও আন্দামান পর্যন্ত পৌঁছতে পারল না। তার আগেই বঙ্গোপসাগরের অথৈ জলে তলিয়ে গেল। একজনও জীবিত রইল না। কানু, বাচ্চু ও টিকুসমেত সকলেরই সলিল সমাধি হল।

১০

এই ঘটনার একমাস পরে সরকার নতুন আইন জারি করল। তাতে বলা হল: আমাদের দেশে আর একজনও বেকার নেই। এখন যদি কেউ সরকারকে বিব্রত করার জন্যে নিজেকে বেকার বলে পরিচয় দেয় তাহলে তার প্রাণদণ্ড হবে।

স্বপ্নঘোর

মা! —মেয়ের গলা পেয়েই মা শোবার ঘর থেকে প্রায় ছুটে এল। কিন্তু দরজা খুলে দেখল মেয়ে একা, হাতে ছোট ভি আই পি স্যুটকেস।

মা উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করল, জামাই কোথায়?

নিউ মার্কেট।—বলে মেয়ে ভিতর ঢুকল।

—নিউ মার্কেট কেন?

—শাড়ি কিনতে।

—কার জন্যে?

—তোমার জন্যে।

আমি শাড়ি নিয়ে কি করব? আমার শাড়ির দরকার নেই।—বলে একটু থেমে জিজ্ঞেস করল, তোরা আজ থাকছিস তো?

—না মা।

—থাকবি না?

—না। টিকিট কাটা হয়ে গেছে। রাত নটায় ট্রেন। কাল সকালে গান্ধীনগর পেঁছতেই হবে।

—কিন্তু তোদের যে আজ থাকার কথা ছিল। চিঠিতে তো সেইরকমই লিখেছিলি।

—লিখেছিলাম। কিন্তু কথা রাখতে পারলাম না। কাল ওকে অফিসে জয়েন করতেই হবে। নইলে খুব ক্ষতি হয়ে যাবে।

—আজকের রাতটুকু থাকতে পারবি না?

—মা! এবার আর এ অনুরোধ করো না, প্লিজ! পরেরবার এসে ঠিক থাকব।

আর থেকেছিস!—বলে মা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। ফেলে অভিমানের সঙ্গে বলল, তুই কি আমার মেয়ে না? তোকে কি আমি তিল তিল করে মানুষ করিনি? তোর ওপর আমার কি কোন অধিকার নেই?

মেয়ে শান্ত গলায় মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল, তুমি খুব রেগে গেছ! চলো, ঘরে চলো।

দরজা খোলা রইল। মা ও মেয়ে শোবার ঘরে ঢুকল। মেয়ে স্যুটকেসটা হাত থেকে মেঝের ওপর নামাল। তারপর মাকে টানতে টানতে বিছানায় এনে বসাল। বসিয়ে নিজে পাশে বসল।

মা বলল, তুই ভীষণ বদলে গেছিস।

মেয়ে বলল, ঠিক বলেছ। আমি অনেক বদলে গেছি। পরের বাড়ির একটা ছেলে আমায় রাতারাতি বদলে দিয়েছে। আমি সব সময় এখন একটা ঘোরের মধ্যে থাকি। ও আমায় প্রতিমুহূর্তে কি বলে জান?

মা কৌতূহলী হয়ে জানতে চাইল, কি?

—আমার হাতের মুঠোয় ও নাকি স্বর্গ এনে দেবে।

—তুই ওর কথা বিশ্বাস করিস না। ছেলেরা বিয়ের পর এরকম বলে থাকে। তোর বাবাও আমাকে এরকম বলত।

—তুমি বিশ্বাস করতে?

—করতাম। তখন বোকা ছিলাম যে।

—আমিও এখন ঠিক সেই তোমার মত বোকা। ও যা বলে তাই বিশ্বাস করি।

—তুই তাহলে মরবি। তোর কপালে দেখছি দুঃখ আছে। আমার কথা শোন, যদি ভাল চাস…

মেয়ে তখন ডান হাত দিয়ে মার মুখ চেপে ধরল। বলল, তুমি এখন ওসব কথা বলো না, বললে ভীষণ কষ্ট পাব।

মা মুখ থেকে মেয়ের হাত সরিয়ে দিল। দিয়ে মেয়ের মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার তাকিয়ে চোখ অন্যদিকে সরিয়ে নিল। শুধু তাই নয়, কথাটা আর শেষ করল না। চুপ করে গেল।

বাইরে অন্ধকার হয়ে আসছে। মা উঠে গিয়ে ঘরের আলো জ্বেলে আবার বিছানায় এসে বসল। মেয়ে তখন মার কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়ল। মেয়ের কপালে মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে মা জিজ্ঞেস করল, কি খাবি?

মেয়ে বলল, কিছু না।

—কেন?

—খিদে নেই।

—তা হয় না। তোদের জন্যে পায়েস করেছি, রাখা আছে। এক বাটি পায়েস খা।

—যাও তাহলে।

মা উঠে গিয়ে পাশের ঘর থেকে এক বাটি পায়েস আর একটা চামচ নিয়ে এল। মেয়ে তখন উঠে বসল। মার হাত থেকে পায়েসের বাটি নিয়ে খেতে শুরু করল। খেতে খেতে বলল, খুব সুন্দর হয়েছে।

—তাহলে আর একটু নে।

—না, আর একটুও নেব না।

—একটু নে।

—উহ্। এই জন্যে তোমার রান্নার প্রশংসা করতে ভয় করে।

মা একথার পর আর কিছু বলল না। বিছানায় এসে বসল। মেয়ে খাওয়া শেষ করে পাশের ঘরে গেল। একটু পরে হাতমুখ ধুয়ে, জল খেয়ে আবার মার কাছে ফিরে এল। মার কোলে মাথা রেখে আবার শুয়ে পড়ল। শুয়ে শুয়েই জিজ্ঞেস করল, বাবা কখন আসবে মা?

এখনি আসবে।—বলে মা একটু থেমে জিজ্ঞেস করল, বাবাকে খুব দেখতে ইচ্ছে করছে?

—খুব।

—মিথ্যে কথা।

—মিথ্যে কথা! কি বলছ তুমি! ওখানে তোমাদের কথা রাতদিন মনে পড়ে।

—তাহলে এত কম চিঠি দিস কেন?

—সময় পাই না যে।

—এত কাজ!

—বিশ্বাস কর…

—তোরা তো দুজন মানুষ। এত কাজ কিসের?

আছে, অনেক কাজ আছে—বলে মেয়ে একটু থেমে বলল, তোমার জামাই শিগগির একটা বাড়ি কিনবে।

—কোথায়?

—ওখানে।

—বাড়িটা তুই দেখেছিস?

—না। শুনেছি একতলা বাড়ি, চারটে ঘর, একটা বড় ডাইনিং স্পেস আছে, রান্নাঘরটাও নাকি খুব সুন্দর। বাড়ির সামনে দুকাঠার মত জমি আছে।

—কত লাগবে ?

—লাখ তিনেক।

—ও এত টাকা কোত্থেকে পাবে ?

—কিছু টাকা জমানো আছে, কিছু টাকা শ্বশুর দেবে। কিছু টাকা লোন করবে। বাড়িটা কেনা হলেই তোমাকে নিয়ে যাব। তুমি যাবে তো ?

মেয়ের মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে মা বলল, যাব, নিশ্চয় যাব।

মেয়ে বলল, সামনের শীতে তোমায় নিয়ে যাব। তোমার ভাল লাগবে। আমি তো দেখিনি, শুনেছি জায়গাটা নাকি খুব সুন্দর। কাছেই গঙ্গা, সারাদিন হু হু করে বাতাস দেয়, গরমের দিনেও পাখা খুলতে হবে না। তোমাকে যেতে হবে কিন্তু।

—বললাম তো, যাব।

মেয়ে তারপর একটু থেমে বলল, তোমার জামাই কি বলেছে জান ?

—কি ?

—বলেছে বাড়িটাকে নাকি একেবারে ছবির মত করে সাজাবে।

—কিরকম ?

—বাড়ির সামনে যে দুকাঠা জমি আছে তাতে নানা ফুলের গাছ লাগাবে, গোলাপ, টগর, জুঁই, হাস্নুহানা, গন্ধরাজ, শিউলি, স্বর্ণচাঁপা, কাঞ্চন... কত কি! আর শীতকালে লাগাবে ডালিয়া, চন্দ্রমল্লিকা, কসমস...ভাল হবে না ?

—খুব ভাল হবে।

—তোমার জামাই আরো কি বলেছে জান ?

—কি ?

—বলেছে বসার ঘরে পার্সিয়ান কার্পেট পাতা থাকবে। তার ওপর রাখা হবে দামী সোফা সেট। আর ঘরের এককোনায় বসানো থাকবে অ্যাকোয়ারিয়াম, তাতে নানা রঙের মাছ খেলা করবে। আর এককোনায় থাকবে বইয়ের আলমারি, তাতে দেশবিদেশের নানা বই থাকবে। আর এককোনায় থাকবে রঙিন টি ভি, ভি সি আর, টেপ রেকর্ডার। আমরা এক একদিন ঘুমোব না, সারারাত ধরে হয় সিনেমা দেখব, নয় গান শুনব। তোমার জামাই খুব ভাল গান গাইতে পারে। এত সুন্দর ওর গলা।

এবার মার চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল। বলল, পুরুষমানুষের কথা কখনো

বিশ্বাস করতে নেই। ওরা মেয়েদের মন পাবার জন্যে ওরকম ইনিয়ে বিনিয়ে অনেক কথা বলে।

মেয়ে একথা শুনে উঠে বসল। বলল, কি বলছ মা। আমি ওর কথা বিশ্বাস করব না।

—না।

মেয়ে অবাক হয়ে কিছুক্ষণ মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। বুঝতে পারল না মা কি বলতে চায়। ফলে রেগে গিয়ে বলল, তুমি বাবার কথা একদিন বিশ্বাস করনি ?

মা শুকনো গলায় উত্তর দিল, বলেছি তো, তখন বোকা ছিলাম বলে করেছি।

—এখন কর না ?

—না।

—কেন ?

—কারণ তোর বাবা যে-সব কথা একসময় বলেছিল তার একটাও রাখেনি।

—একটাও না ?

না। একটা কথাও না।—বলে একটু থেমে মা বলল, বিয়ের পরেই তোর বাবা আমাকে কি বলেছিল জানিস ?

মেয়ে হেসে বলল, তা আমি কি করে জানব ?

—শোন তাহলে। তোর বাবা বলেছিল আমাকে একটা ফ্ল্যাট কিনে দেবে, আর সেই ফ্ল্যাটে আমাকে রানী করে রাখবে। কিন্তু আজ পর্যন্ত সে ক্ষমতা তোর বাবার হল না। সারা জীবন ভাড়াবাড়িতে থাকতে হল। আর রানীর বদলে হলাম ঝি। সংসারের পিছনে খাটতে খাটতে হাড়মাস কালি হয়ে গেল।

মেয়ে হেসে জিজ্ঞেস করল, বাবা আর কি বলেছিল ?

—আরো কত কথা বলেছিল। বলেছিল বছরে একবার করে আমাকে প্লেনে চড়াবে। বছরে একবার দূরে থাক, আজ পর্যন্ত একবারো আমাকে প্লেনে চড়াল না।

মেয়ে হেসে আবার জিজ্ঞেস করল, বাবা আর কি বলেছিল মা ?

আরো কত কি বলেছিল। সব কথা কি আর মনে আছে ?—বলে অতীত কালে স্বামীর দেওয়া নানা মিথ্যে প্রতিশ্রুতির কথা ভাবতে শুরু করল।

ভাবতে ভাবতে একসময় বলে উঠল, হ্যাঁ, মনে পড়েছে। তোর বাবা বলত আমরা এমনভাবে স্বামী-স্ত্রীর জীবন কাটাব যা কোন দম্পতি কোনদিন কাটায়নি। আমি শুনে ভাবতাম সে-বোধহয় একটা অদ্ভুত জীবন হবে। দেখতে দেখতে মাসের পর মাস গেল, বছরের পর বছর গেল, আমি বুড়িয়ে গেলাম। কোথায় সেই অদ্ভুত জীবন! সব স্বামী-স্ত্রী যেভাবে জীবন কাটায় আমরাও সেভাবে কাটাচ্ছি। এর মধ্যে নতুনত্ব কোথায়? আমি তাই তোর বাবার কথা আর শুনি না। তোর বাবার ওপর এখন আমার ঘেন্না ধরে গেছে।

মেয়ে এই সময় বলে উঠল, বাবা তো এখনো এলো না মা।

মা মুখ ঝামটা দিয়ে বলল, ঐরকম তোমার বাবার কাণ্ডজ্ঞান। জানে মেয়ে-জামাই আজ বিকেলে আসবে, অথচ দেখ···

কথা শেষ হল না। ঘরের বাইরে পায়ের শব্দ। মার কথা থেমে গেল।

মেয়ে বলল, ঐ বোধহয় এল।

না, বাবা নয়, জামাই ঘরে ঢুকল। হাতে একটা প্যাকেট। শাশুড়িকে প্রণাম করে প্যাকেটটা শাশুড়ির হাতে তুলে দিল। বলল, এটা নিন।

মা জিজ্ঞেস করল, কি আছে এতে? শাড়ি?

—হ্যাঁ।

—শাড়ি কি হবে?

—আপনার জন্যে নিয়ে এলাম।

মা শাড়িটা বিছানায় রেখে বলল, বসো।

জামাই একটা চেয়ার টেনে নিয়ে শাশুড়ির মুখোমুখি বসল। মা তখন একটু রাগের সঙ্গেই জিজ্ঞেস করল, তোমরা নাকি আজকেই চলে যাবে?

জামাই উত্তর দিল, হ্যাঁ।

—কেন? তোমাদের তো আজ এখানে থাকার কথা ছিল।

—এবার আর হল না।

—এত কাজ!

জামাই উত্তরে একটু চুপ করে থেকে বলল, আমি তো ছুটি নিয়ে আসিনি। এদিকে এসেছি অফিসের কাজে। তাই বাড়িতেও এক রাতের বেশি থাকতে পারিনি। গতকাল বাবা-মাকে দেখতে বর্ধমান গেছি, আজ আপনাদের দেখতে কলকাতায় এসেছি। আগামীকাল গান্ধীনগর ফিরে যাব, আমাকে

যেতেই হবে।

মা একথার পর আর কিছু বলল না। না বলে বিছানা থেকে নামল।

জামাই জিজ্ঞেস করল, কোথায় যাচ্ছেন ?

আসছি।—বলে মা পাশের ঘর থেকে চামচসমেত এক বাটি পায়েস নিয়ে এল।

জামাই পায়েসের বাটির দিকে তাকিয়ে বলল, আমার জন্যে। আমি এতো খেতে পারব না।

খুব পারবে।—বলে মা বাটিটা জামাইয়ের হাতে তুলে দিল।

জামাই আর আপত্তি করল না। চামচ দিয়ে পায়েস খেতে লাগল। খেতে খেতে বলল, সামনের শীতে কিন্তু আমাদের ওখেনে আপনাদের যেতে হবে।

মা বিছানায় বসে বলল, দেখি।

একথায় মেয়ে রেগে গিয়ে বলল, দেখি আবার কি। তোমাকে যেতে হবে।

—কিন্তু তোর বাবার শরীরটা তো খুব ভাল নেই।

—ও নিয়ে তোমায় ভাবতে হবে না।

জামাই বলল, আপনি না গেলে আমরা ভীষণ দুঃখ পাব।

মা উত্তরে শুধু হাসল।

জামাই পায়েস শেষ করে বাটিটা টি-টেবিলের ওপর রাখল। তারপর মুখ ধুয়ে জল খেয়ে আবার চেয়ারে এসে বসল।

মা এবার বলল, তুমি নাকি বাড়ি কিনছ ?

জামাই সঙ্গে সঙ্গে নিজের স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, এখনি এসব কথা মাকে বলতে গেলে কেন ?

—কি হবে বললে ?

—হবে না কিছুই। কিন্তু আমি তোমাকে বারণ করেছিলাম। বারবার করে বলেছিলাম একথা এখন কাউকে বলো না। আগে বাড়ি কেনা হোক, তারপর বলো, তোমার আর তর সইলো না।

—কেনা তো হবে।

—যখন হবে তখন হবে। আগে থাকতে কথাটা বলে তুমি ভাল করনি।

মেয়ের গলার স্বর এবার তীব্র হয়ে উঠল। বলল, আমি কি কথাটা রাস্তার লোককে ধরে বলেছি ? বলেছি তো মাকে। এতে দোষের কি হল ?

—এতে দোষের কিছু নেই। তবু…

মার গলার স্বর কঠিন হয়ে উঠল, তাহলে মেয়েকে একথা বলতে গেলে কেন?

জামাই এ প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে চুপ করে রইল।

মা বলতে লাগল, চুপ করে রইলে কেন? আমার কথার জবাব দাও। ঠিক যখন করনি তখন কেন বাড়ি কেনার কথা ওকে বলতে গেলে? কেন বলতে গেলে খুব সুন্দর জায়গা, কাছেই গঙ্গা, সারাদিন হু হু করে বাতাস দেয়, গরমের দিনেও পাখা খুলতে হয় না?

জামাই উত্তরে কোন কথা বলল না। মেয়েও চুপ করে রইল।

মা একটু থেমে আবার শুরু করল, কেন বলতে গেলে বাড়ির সামনে দুকাঠা জমি আছে, তাতে ফুলের গাছ লাগাবে—গোলাপ, টগর, জুঁই, হাস্নুহানা, গন্ধরাজ, শিউলি, স্বর্ণচাঁপা, কাঞ্চন…কত কি? কেন বলতে গেলে শীতকালে লাগাবে ডালিয়া, চন্দ্রমল্লিকা, কসমস?

জামাই এরপরও চুপ করে রইল। মেয়েও কিছু বলল না।

মার কথাও শেষ হল না। উত্তেজিত হয়ে বলতে লাগল, বলো কেন বলেছ ঘরে পাতবে পার্শিয়ান কার্পেট, তার ওপর রাখবে দামী সোফা-সেট? কেন বলেছ ঘরের এককোনায় বসানো থাকবে অ্যাকোয়ারিয়ম, তাতে নানা রঙের মাছ খেলা করবে; ঘরের আর এককোনায় থাকবে বইয়ের আলমারি, তাতে থাকবে দেশবিদেশের নানা বই; আর এক কোনায় থাকবে রঙিন টি ভি, ভি সি আর, টেপ রেকর্ডার? এসব বলার কোন মানে হয়? শুধু তাই নয়, তুমি বলেছ তোমরা নাকি এক একদিন ঘুমোবে না, সারারাত ধরে সিনেমা দেখবে, গান শুনবে…বলো, এসব মিথ্যে?

এবার জামাই মুখ খুলল। খুব মৃদু গলায় বলল, সব সত্যি।

মা ঝাঁঝালো গলায় বলে উঠল, সব সত্যি। কিন্তু কথাগুলো তো মিথ্যে। তুমি আমার মেয়েকে ঠকাচ্ছ, তুমি ওকে মিথ্যে স্বপ্ন দেখাচ্ছ। তুমি জান না এর ফল কি হতে পারে।

—কি হবে?

—যখন ও জীবনে এসব কিছুই পাবে না, জানতে পারবে সব ভাঁওতা, তখন ওর জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠবে, বেঁচে থাকা অর্থহীন হয়ে যাবে। আমার একটা মেয়ে, ভীষণ আদরের, তুমি ওর জীবন নষ্ট করো না। তুমি

আর ওকে ঐসব মিথ্যে স্বপ্ন দেখিও না।

জামাই মৃদু গলায় এর প্রতিবাদ করে বলল, এসব মিথ্যে স্বপ্ন নয়। আপনি আমায় ভুল বুঝবেন না। আপনি দেখবেন একে একে আমাদের সব হবে।

—সব হবে। তুমি কত টাকা মাইনে পাও?

একথায় জামাই ভীষণ অপমানিত বোধ করল। তার চোখমুখ মুহূর্তের মধ্যে লাল হয়ে উঠল। উত্তরে কি বলবে তা খুঁজে না পেয়ে নিজের স্ত্রীর উদ্দেশে বলল, চলো, ওঠা যাক। দেরি হয়ে যাচ্ছে।

চলো।—বলে মেয়েও ক্রুদ্ধ হয়ে বিছানা থেকে নেমে মাকে প্রণাম করে চলে যাবার জন্য প্রস্তুত হল।

জামাই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। শাশুড়িকে প্রণাম করে ভি আই পি স্যুটকেস হাতে নিয়ে বলল, আসছি।

তারপর একটু থেমে বলল, আমি আপনার মেয়েকে মিথ্যে স্বপ্ন দেখাচ্ছি না। আপনি আমার কথা বিশ্বাস করতে পারেন।

তোমার শ্বশুরও একদিন আমাকে নানা কথা বলেছিল, নানা স্বপ্ন দেখিয়েছিল। আমার তখন মেয়ের মতই অল্প বয়স। আমি তখন কিছু বুঝতাম না। আমি তার সব কথা বিশ্বাস করেছিলাম। কিন্তু তোমার শ্বশুর তার একটা কথাও রাখেনি।—বলে একটু থেমে বলল, আমি আর কোন পুরুষমানুষের কথা বিশ্বাস করি না। তোমরা সবাই সমান।

একথার জবাবে মেয়ে-জামাই কিছু বলল না। নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। যাবার আগে মেয়ে শুধু বলল, বাবার সঙ্গে দেখা করার খুব ইচ্ছে ছিল, সেটা আর হল না।

মা বলল, আর কিছুক্ষণ থেকে যা।

—তা আর হয় না। অনেক দেরি হয়ে গেছে।

মা আর কিছু বলল না। ওরা চলে গেল। মা ঘরের দরজা থেকে জানালায় এসে দাঁড়াল। দেখল মেয়ে-জামাই বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাস্তার জনস্রোতে মিশে গেল। তাদের আর দেখতে পেল না। না পেলেও মা বিছানায় ফিরে এল না। জানালায় দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে একসময় তার দুচোখ ছাপিয়ে জল চলে এল। হাত দিয়ে সে-জল মুছে মেয়ের উদ্দেশে মনে মনে বলল, পোড়ারমুখী, তুইও আমার মত কষ্ট পাবি।

আর, ঠিক এইসময় পিছন থেকে স্বামীর গলা শুনতে পেল, জানলায় দাঁড়িয়ে আছ কেন ? কি দেখছ ?

জানালা থেকে মুখ ঘুরিয়ে স্বামীর দিকে তাকিয়ে খুব বিরক্তির সঙ্গে বলল, এতক্ষণে তোমার আসার সময় হল ? কি এমন রাজকাজ করছিলে ?

বাবা উত্তরে মুখে হাসি এনে বলল, তা এটা রাজকাজই বলতে পার।

—মানে ?

বলছি।—বলে বাবা জিজ্ঞেস করল, মেয়ে-জামাই এখনো এল না কেন ? ওরা তো চিঠিতে লিখেছিল···

মা গম্ভীর গলায় বলল, ওরা এসে চলে গেছে ।

বাবা বিস্মিত হল, কখন গেল ?

—একটু আগে।

—সে কি ! ওদের তো আজ থাকার কথা ছিল। থাকল না কেন ?

—জামাইকে নাকি কালই অফিসে জয়েন করতে হবে। থাকার সময় নেই। খুব কাজ।

—এত কাজ যে মেয়ে-জামাইয়ের আমার সঙ্গে দেখা করার অবসর হল না !

—আর তোমারো এত কাজ যে মেয়ে-জামাইয়ের সঙ্গে দেখা করার অবসর হল না।

একথায় বাবা একটু রেগে গিয়ে বলল, দেখো, এখন আজেবাজে কথা বলো না। মেয়ে-জামাই আমার সঙ্গে দেখা না করে চলে গেল—কি বিচ্ছিরি ব্যাপার ! এরকম তো কোনদিন হয়নি। তুমি মেয়েকে কিছু বলেছিলে ?

—আমি মেয়েকে কি বলতে যাব !

—জামাইকে ?

—না। তবে একটা কথা ওদের বলেছি।

বাবা যেন আতঙ্কিত হয়ে জিজ্ঞেস করল, কি বলেছ ?

—জামাই মেয়েকে নানা মিথ্যে স্বপ্ন দেখাতে শুরু করেছে। আমি মেয়েকে বলেছি, এসব কথা বিশ্বাস করিস না। সব ছেলেরাই বিয়ের পর এরকম বলে থাকে।

—আর, জামাইকে কি বলেছ ?

—বলেছি আমার মেয়েকে তুমি আর মিথ্যে স্বপ্ন দেখিও না। এর ফল ভালো হবে না। তবে এর জন্যে ওরা চলে যায়নি। ওরা থাকবে না, তা

আগে থাকতেই ঠিক করা ছিল।

—থাকলেও তোমার এসব কথা বলা ঠিক হয়নি।

—আমি ঠিক করেছি। আমার মত আমার মেয়েও মিথ্যে স্বপ্নের পিছনে ছুটে মরুক, তা আমি চাই না।

বাবা অবাক হয়ে বলল, তুমি মিথ্যে স্বপ্নের পিছনে ছুটেছ। কে ছোটাল ?

মা অভিমানভরা গলায় বলল, তুমি, তুমিই ছুটিয়েছ।

—আমি। কি ভাবে ?

—তুমি বিয়ের পরেই বলেছিলে আমাকে একটা ফ্ল্যাট কিনে দেবে। দিয়েছ ? তুমি বলেছিলে বছরে একবার করে আমাকে প্লেনে চড়াবে। চড়িয়েছ ? তুমি বলেছিলে এমনভাবে আমরা জীবন কাটাব যা কোন স্বামী-স্ত্রী কোনদিন কাটায়নি। কাটিয়েছ ?

এবার সমস্ত ব্যাপারটা বুঝতে পেরে বাবা হেসে ফেলল। তারপর একটু থেমে স্ত্রীর সামনে এসে দাঁড়াল। দাঁড়িয়ে আস্তে আস্তে বলল, আমি তোমাকে কোন মিথ্যে স্বপ্ন দেখাইনি।

—দেখাওনি। তাহলে আমার ফ্ল্যাট কোথায় ?

আহ! আমার কথা শেষ করতে দাও।—বলে বাবা বলতে লাগল, আজ বাড়ি ফিরতে দেরি হল কেন, তা জানো ? দেরি হল তোমার জন্যে, হ্যাঁ, তোমার বাড়ির জন্যে। ফ্ল্যাট নয়, আমি তোমায় বাড়ি কিনে দেব। আমার আর তিন বছর চাকরি আছে। তারপর আমরা কি আর এই নোংরা শহরে থাকব। নাকি এখানে থাকা যায় ? আমরা হরিদ্বার চলে যাব। ওখানে বাড়ি কিনব, তোমার নামেই কিনব। খুব সুন্দর ছোটখাট একতলা বাড়ি। সে বাড়ির যে-কোন জানলা খুললেই চোখে পড়বে নদী, পাহাড়, জঙ্গল, ছোট ছোট বাড়ি কি। ভালো লাগবে বলো তো ? আমরা বাকি জীবন ওখানেই কাটাব। মাঝে মাঝে অবশ্য এখানে-সেখানে যাব। ভাবছ, কিসে যাব ? না, ট্রেনে যাব না। কক্ষনো না। আমরা প্লেনে করে দিল্লি যাব, মাদ্রাজ যাব। সারা জীবন অনেক কষ্ট করেছি, আর নয়, শেষ জীবনটা এবার শান্তিতে কাটাব। তুমি ভাবছ আমি মিথ্যে কথা বলছি। তোমাকে ধাপ্পা দিচ্ছি। তুমি অপেক্ষা কর, এখনি একজন আসবে। হরিদ্বারে তার একটা বাড়ি আছে, সুন্দর বাড়ি। বাড়িটা সে বিক্রি করতে চায়। ওকে

বলেছি, বাড়িটা আমি কিনব। দর এখনো ঠিক হয়নি, আজই ঠিক হবে। তোমার সামনেই ঠিক হবে।

মার চোখমুখ থেকে মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত অবিশ্বাস, সন্দেহ, অভিমান, তিক্ততা মুছে গেল। নতুন একটা স্বপ্নের মায়া সে-মুখের ওপর যেন ছড়িয়ে পড়ল। বাহান্ন বছর বয়সে সেখানে ফুটে উঠল বিহ্বলতা। তবু অবিশ্বাস গিয়েও যায় না। সন্দেহ কাঁটার মত উঁকি মারে। মা জিজ্ঞেস করল, সত্যি?

—আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না।

—না।

—কেন?

—সাতাশ বছর ধরে তুমি আমাকে ঠকাচ্ছ। তাই আজ আর তোমাকে বিশ্বাস করতে সাহস হচ্ছে না।

বাবা হেসে বলল, সাহস হচ্ছে না। তাহলে শোন।

—কি শুনব?

—সিঁড়িতে পায়ের শব্দ। কে একজন ওপরে উঠে আসছে না।

—আমি কোন শব্দ শুনতে পাচ্ছি না।

—ভালো করে শোন। কান খাড়া করে শোন। শুনতে পাচ্ছ? লোকটা ক্রমশ ওপরে উঠে আসছে, ক্রমশ ওর পায়ের শব্দ স্পষ্ট হচ্ছে। আমি ওর কাছ থেকেই বাড়িটা কিনব। খুব ভালো লোক।

—কিন্তু আমি কিছু শুনতে পাচ্ছি না।

—এবার বাবা রেগে গেল। বলল, শুনতে পাচ্ছ না। তুমি কি কালা হয়ে গেলে? আমি তো দিব্যি শুনতে পাচ্ছি! শোন এবার, ভালো করে শোনার চেষ্টা কর। এবার শুনতে পাচ্ছ?

মা সত্যি সত্যি সিঁড়িতে কোন পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছে কি না তা স্পষ্ট বুঝতে পারল না। একবার তার মনে হল, পাচ্ছে। আর একবার মনে হল, পাচ্ছে না। তবু শুনতে পাচ্ছে মনে করেই বলল, পাচ্ছি।

বাবা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল, পাচ্ছ!

মা বলল, পাচ্ছি।